

পর্যটন বিচ্ছিন্না

মে ২০২৩

পড়তে পড়তে গন্তব্যে...



LET'S DAY OUT

রিভার ক্রুজ RIVER CRUISE



পিকনিক PICNIC

Your Events

Corporate Outing

Annual Picnic & Cruise

School Day out

Social get-together

Corporate Team Building

Our Services

Transportation

Spot Reservation

Vessel Reservation

Branding & Cultural Program

Meals, Fun & Entertainment



RIVER AND GREEN TOURS

House-97/1, Flat-2B, Sukrabad, Sher-e-Bangla Nagar
Dhaka-1207. Bangladesh

E-mail: rgtour@gmail.com, info@riverandgreen.com

www.riverandgreen.com

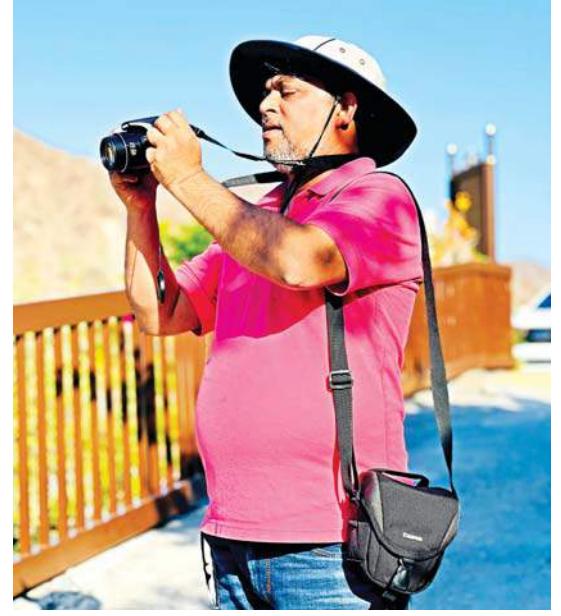
+88 01819224593, 01979224593

ଶ୍ରୀମତୀ କିଣ୍ଠେଳୀ

ପଡ଼ିବେ ପଡ଼ିବେ ଗନ୍ଧୀ...

www.parjatanbichitra.com





সম্পাদকীয়

বিশ্বব্যাপী উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে পর্যটন

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে পর্যটন

পর্যটন বিশ্ব অর্থনৈতির সবচেয়ে দ্রুত বর্ধমান ও বহুমাত্রিক অন্যতম কেন্দ্রীয় খাত। বর্তমানে বিশ্বব্যাপী ১১ ধরনের চাকরির মধ্যে একটি চাকরি পর্যটন শিল্প প্রদান করে থাকে। অর্থাৎ মোট চাকরির ১০ শতাংশ অবস্থান এই পর্যটন শিল্পে। কেভিট পূর্ববর্তী ২০১৯ সালের পরিসংখ্যান অন্যায়ী, বিশ্ব অর্থনৈতিতে পর্যটন অবদান রাখে ৮ দশমিক ৯ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার; যা বিশ্ব জিডিপিতে ১০ দশমিক ৩ শতাংশ অবদান। এই শিল্পের সঙ্গে সমগ্র বিশ্বে ৩৩০ মিলিয়ন মানুষ কর্মরত রয়েছে। সমগ্র বিশ্বে ১৫০ কোটি পর্যটক রয়েছে। অর্থাৎ প্রতি ৭ জনে ১ জন পর্যটক।

এসব বিবেচনায় টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বা এসডিজি অর্জনে পর্যটন একটি গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন মাধ্যম হিসেবে ভূমিকা রাখেছে। উন্নত ও উন্নয়নশীল প্রতিটি দেশের জন্যই পর্যটন শিল্প সমানভাবে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রযোজ্য। ২০৩০ সাল নাগাদ বিশ্বব্যাপী উন্নয়নের জন্য লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের বিভিন্ন এজেন্ডা গ্রহণ করা হয়েছে; যা বিভিন্ন দেশ নিজ নিজ অবস্থার প্রেক্ষিতে বাস্তবায়ন শুরু করেছে। মিলিনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল বা এমডিজি'র ওপর ভিত্তি করে এসডিজি অর্জনে ১৭টি লক্ষ্য ও ১৬৯টি সংশ্লিষ্ট লক্ষ্য নির্ধারণ করে কার্যক্রম সেট তৈরি করা হয়েছে; যার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পর্যটন শিল্প প্রায়ক্ষণ বা পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট থাকলেও বিশেষ করে লক্ষ্যমাত্রা ৮, ১২ ও ১৪ অর্জনে অর্থাৎ অন্তর্ভুক্তিমূলক টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃক্ষ, টেকসই ভোগ ও উৎপাদন (SCP) এবং মহাসাগর ও সামুদ্রিক সম্পদের টেকসই ব্যবহার সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পর্যটন শিল্প সরাসরি সম্পৃক্ত রয়েছে। তবে এই এজেন্ডা অর্জনের জন্য একটি সুস্পষ্ট বাস্তবায়ন কাঠামো, প্রযুক্তি, অবকাঠামো এবং মানব সম্পদে পর্যাপ্ত অর্থায়ন এবং বিনিয়োগ প্রয়োজন রয়েছে।

এসডিজি লক্ষ্য-৮, যেখানে উপর্যুক্ত কাজ এবং অর্থনৈতিক প্রবৃক্ষ বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। পর্যটন বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক প্রবৃক্ষের অন্যতম চালিকাশক্তি এবং বর্তমানে বিশ্বব্যাপী ১১টির মধ্যে একটি চাকরি প্রদান করে পর্যটন। পর্যটন খাতে শালীন কাজের (Decent work) সুযোগ রয়েছে, বিশেষ করে যুবক এবং নারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে পেশাগত উন্নয়নে ব্যোপক সভাবনার ক্ষেত্র পর্যটন। পর্যটনকে টেকসই উন্নোট করার জন্য নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে; যা কর্মসংস্থান সৃষ্টিসহ স্থানীয় সংস্কৃতি ও পণ্য বিকশিত করবে। কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে এই সেক্টরের অবদান এসডিজি লক্ষ্য-৮.৯ বিশেষভাবে উল্লেখ রয়েছে।

এসডিজি লক্ষ্য-৮; যেখানে মানবসম্পদ উন্নয়ন একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম হিসেবে উল্লেখ রয়েছে। পর্যটনের উন্নয়নে সুপ্রশিক্ষিত এবং দক্ষ জনশক্তি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। খাতটি শিক্ষা ও বৃক্ষমূলক প্রশিক্ষণে বিনিয়োগের জন্য প্রোগেডনা প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি তৈরি করার বিষয়ে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। বিশেষ করে যুবক, নারী, প্রবীণ নাগরিক, আদিবাসী এবং বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ করে গড়ে তোলার বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। যেখানে পর্যটনের অন্তর্ভুক্তি, সহনশীলতা, শাস্তি ও অহিংসার সংক্ষিতির মূল্যবোধ এবং বিশ্বব্যাপী পর্যটনে দক্ষ জনশক্তি বিনিয়োগের মাধ্যমে টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃক্ষ উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখা সভাবনা রয়েছে।

এসডিজি লক্ষ্য-১২; যেখানে দায়িত্বশীল খরচ এবং উৎপাদন বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। পর্যটন শিল্পে স্থানীয় পণ্যের ব্যবহার এবং উৎপাদনের (SCP) মাধ্যমে টেকসই পর্যটনের জন্য টেকসই উন্নয়ন প্রাবল্যগুলি নির্মাণ করার প্রয়োজনীয় সরঞ্জামগুলি নির্ধারণ এবং বাস্তবায়ন করতে হবে যা স্থানীয় কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে, স্থানীয় সংস্কৃতি এবং পণ্যের প্রচারণা করবে। টেকসই খরচ এবং উৎপাদন প্রক্রিয়া সম্পর্কিত ‘ফ্রেমওয়ার্ক অব প্রোগ্রাম’ টেকসই পর্যটন প্রোগ্রামের (STP) লক্ষ্য

হলো- পণ্ডের টেকসই ব্যবহার এবং উৎপাদন বৃদ্ধি করা; যার ফলে অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং পরিবেশগত উন্নয়ন সম্ভব হবে।

এসডিজি লক্ষ্য-১৪, যেখানে পানির নিচে জীবন বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। উপকূলীয় এবং সামুদ্রিক পর্যটন পর্যটনের সবচেয়ে বড় অংশ, বিশেষ করে ছোট দীপ, উন্নয়নশীল রাজ্যগুলির (SIDS) সামুদ্রিক পর্যটনের ওপর নির্ভর করে। লক্ষ্য-১৪.৭ এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে সামুদ্রিক আকর্ষণ সংরক্ষণে পর্যটনকে অবশ্যই সমন্বিত উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনার একটি অংশ হতে হবে এবং পর্যটন ঝঁ-ইকোনমিকে উন্নাত করার একটি বাহন হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করবে। ২০৩০ সালের মধ্যে SIDS এবং LDCs-এর অর্থনৈতিক সুবিধা বৃদ্ধি করা। মৎস্য, জলজ চাষ এবং পর্যটনের টেকসই ব্যবস্থাপনাসহ সামুদ্রিক সম্পদের টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

এছাড়া, পর্যটন গন্তব্যস্থলে স্থানীয় পণ্ডের উৎপাদন, ব্যবহার ও বিক্রয়কে উৎসাহিত করার মাধ্যমে কৃষি উৎপাদনশীলতাকে বৃদ্ধি করতে পারে। উপরন্তু কৃষি-পর্যটন, একটি ক্রমবর্ধমান পর্যটন বিভাগ, ঐতিহ্যগত কৃষি কার্যক্রমের পরিপূরক হতে পারে। এই কৃষি-পর্যটনের মাধ্যমে স্থানীয় সম্পদায়ের মধ্যে কৃষি কাজে উৎসাহ ও আয় বৃদ্ধির সুযোগ তৈরি করে কৃষি কার্যক্রমের টেকসই উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে।

লিঙ্গের সমতার বিষয়ে পর্যটন শিল্পের ব্যাপক ভূমিকা রয়েছে। এই শিল্প নারীকে একাধিক উপায়ে ক্ষমতায়ন করতে পারে, বিশেষ করে চাকরির ব্যবস্থার মাধ্যমে এবং ছোট ও বৃহত্তর পর্যটন ও আতিথেয়তা সম্পর্কিত উদ্যোগে আয়-উৎপাদনের সুযোগের মাধ্যমে। নারীদের কর্মসংস্থান এবং উদ্যোক্তাদের সর্বোচ্চ অংশীদারিত্বের একটি খাত হিসেবে, পর্যটন নারীদের জন্য তাদের সত্ত্বাবন্ধ উন্মোচন করার একটি উল্লেখযোগ্য মাধ্যম হিসেবে বিবেচ্য হয়েছে।

জীববৈচিত্র্য ও প্রাকৃতিক ঐতিহ্যবাহী স্থান সংরক্ষণে পর্যটন শিল্পের ব্যাপক ভূমিকা রয়েছে। পর্যটকদের গন্তব্যে নির্বাচনের বিষয়ে ঐতিহাসিক ল্যাঙ্কেপে, বন-জঙ্গল, সমৃদ্ধ জীববৈচিত্র্য এবং প্রাকৃতিক ঐতিহ্যবাহী স্থানগুলি অনেকক্ষেত্রে বিবেচ্য হয়ে থাকে। সেক্ষেত্রে দায়িত্বশীল ও টেকসই পর্যটন কার্যক্রমের মাধ্যমে শুধুমাত্র জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ বিষয়ে নয় বরং ঐতিহ্যবাহী স্থানগুলির প্রতি দায়িত্বশীল আচরণের মাধ্যমে, স্থানীয় উভিদ ও জীববৈচিত্র্যের সংরক্ষণ এবং এর সচেতনতা বৃদ্ধির কার্যক্রমে পর্যটন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

বাংলাদেশ নদীমাত্রক দেশ। আমাদের গ্রামীণ ঐতিহ্য, স্থানীয় সংস্কৃতি, জীবনযাত্রা, আতিথেয়তা ইত্যাদি পর্যটকদের কাছে অনন্য আকর্ষণ। তবে এসব আকর্ষণকে পর্যটন পণ্ডে পরিণত করে স্থানীয় ও প্রাকৃতিক জনগোষ্ঠীকে পর্যটন শিল্পের সাথে অতির্ভুক্তির মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতি সচল করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে পর্যটন।

বিশ্বব্যূগী পর্যটকদের চাহিদার জায়গায় গ্রামীণ পর্যটন, কমিউনিটি ট্যুরিজম, অভিজ্ঞতামূলক পর্যটন, স্লো ট্রাভেল, ইত্যাদি আকর্ষণীয় হয়ে উঠছে। সে বিবেচনায় বাংলাদেশের রয়েছে এই শিল্পের অপার সত্ত্বাবন। আমাদের রয়েছে বিশ্ব ঐতিহ্য সুন্দরবন, প্রত্নতাত্ত্বিক নির্দশন পাহাড়পুর ও ষাট গম্বুজ মসজিদ। রয়েছে বিস্তীর্ণ রামসার সাইট টাঙ্গুয়ার হাওড়, বিস্তীর্ণ চা বাগান, বিশেষ দীর্ঘতম প্রাকৃতিক সমুদ্র সৈকত কক্সবাজার, সুরোদয় ও সুর্যাস্তের সৈকত কয়াকাটা, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের আধার দ্বীপাথল-নিবুম দ্বীপ, সোনাদিয়া, সেন্টমার্টিন, মহেশখালী, বিস্তীর্ণ উপকূলীয় অঞ্চল। এছাড়া রয়েছে গ্রামীণ ঐতিহ্য, স্থানীয় সংস্কৃতি, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের পার্বত্য অঞ্চল, বৈচিত্র্যময় জীবনযাত্রা ও সর্বোপরি এই দেশের অতিথিপূর্বান মানুষ। এসবই পর্যটকদের আকর্ষণের অন্যতম অন্যতম, পর্যটন শিল্পের সমৃদ্ধ উপাদান; যার সাথে দেশগত বিশাল জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রা, আবেগ, সংস্কৃতি ও জীবন-জীবিকা সম্পর্কিত। পর্যটন শিল্পের এসব উপাদান পরিকল্পিত ও সমন্বিতভাবে পর্যটন পণ্ডে উন্নীত করে পর্যটকদের কাছে বিপণন করতে হবে। তবেই সংশ্লিষ্ট বিশাল জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক মন্তি ঘটিবে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে এভাবেই বাংলাদেশের পর্যটন শিল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

প্রকাশক ও সম্পাদক মো. মহিউদ্দিন হেলাল কর্তৃক সম্পাদকীয় কার্যালয় থেকে প্রকাশিত এবং টেকমি প্রিন্টার্স প্রেস ২৬৭/জি, কমিশনার গলি, ফরিদাবাদ, মতিবাল, ঢাকা-১০০০ থেকে মুদ্রিত।

পর্যটন বিচিত্রা-এ প্রকাশিত কোনো লেখা ও তার কোনো অংশ প্রকাশক ও সম্পাদকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত মূলে বা অনুবাদে প্রকাশ করা যাবে না।

সম্পাদক
মহিউদ্দিন হেলাল

ব্যবস্থাপনা সম্পাদক
ঝর্ণা মহিউদ্দিন

সহযোগী সম্পাদক
মীর শামসুল আলম বাবু

গবেষণা
ড. মো. আতাউর রহমান
জিয়াউল হক হাওলাদার
সাহিদ হোসেন শামীম
ইমরান উজ-জামান

ফিচার
হোমায়েদ ইসহাক মুন
মারজিয়া লিপি

ফেয়ার ও বাণিজ্য সম্পাদক
বোরহান উদ্দিন

হেড অব
মার্কেটিং ও কমিউনিকেশন
সালাউদ্দিন অটন

বাণিজ্যিক নির্বাহী
মেহেদী হাসান
সোহেল মিয়া

সার্কুলেশন
আতিকুল মোল্লা

শিল্প নির্দেশক
নাজির খান খোকন

গ্রাফিক ডিজাইন
মো. খোকন মিয়া
মো. আবু বক্র সিদ্দিক

বিদেশ সংযোগ
আশরাফুজ্জামান উজ্জল
জুন মুখাজী
শিমুল রহমান

সম্পাদকীয় কার্যালয়

বাণিজ্যিক কার্যালয়
বাড়ি ৯৭/১, ২য় তলা (২-বি)
শুকাবাদ, ঢাকা-১২০৭
ফোন : +৮৮০২-১২২১২৯৪৪
ইমেইল : parjatanbichitra@gmail.com
info@parjatanbichitra.com
ওয়েব : www.parjatanbichitra.com

নির্বাচিত কার্যালয়
এমআর সেন্টার (৭ম তলা) বাড়ী-৪৯
রোড-১৭ বনানী বা/এ, ঢাকা-১২১৩
বাংলাদেশ

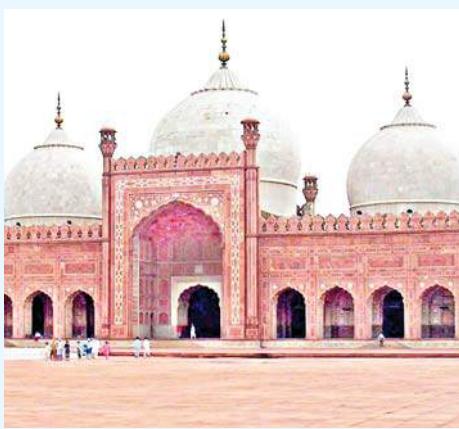


পর্যটন বিচিন্না

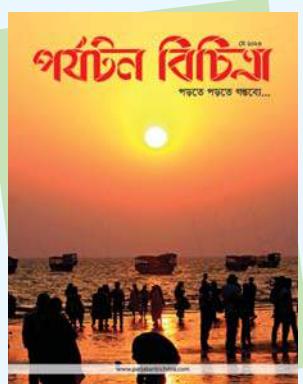
মে ২০২৩



বাংলাদেশি পর্যটকদের নয়া গন্তব্য জাপান ▶ ২৬



লাহোরে মোগলকীর্তি দর্শনে ▶ ১৯



প্রচ্ছদ: কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকত
আলোকচিত্র: আরিফুর রহমান



চৈত্র-বৈশাখ মেলার আডং ▶ ৩৪

আরও যা থাকছে এই সংখ্যায়—

- | | |
|---|----|
| দক্ষিণের পর্যটন শিল্পে নতুন সম্ভাবনা | ০৫ |
| ঢাকার পাঁচতারকা হোটেল শেরাটন | ০৮ |
| সবুজের শহরে আভিজ্ঞাত্যের তোরণ | ১০ |
| সুন্দরবনে এমভি ক্রাউন বিলাসী ভ্রমণ | ১১ |
| পন্দ্যায় হারানো স্থাপনার সন্ধানে | ১৩ |
| ছুটির দিনে ঘুরে আসুন আহসান মঞ্জিল | ১৫ |
| পুরান ঢাকার দৃষ্টিনন্দন তারা মসজিদ | ১৭ |
| জামালপুর জেলার প্রত্নপ্যট্টন সভাবনা | ২২ |
| কেন ঘূরতে যাবেন ইন্দোনেশিয়া | ২৭ |
| ঈদের ছুটিতে ঢাকায় কোথায় বেড়াবেন | ২৮ |
| ঘুরে আসতে পারেন বালিয়াটি প্রাসাদ | ২৯ |
| ফটো অ্যালবাম | ৩২ |
| বরগুনায় রাখাইনদের জলকেলি উৎসব | ৩৭ |
| বাংলা নববর্ষে ঈদ, ঈদপর্বে নববর্ষ | ৩৮ |
| ভার্জিনিয়ার সবুজ শাল্টসভিলে | ৪১ |
| পাস্তুয়াই বরনার টানে | ৪৩ |
| সাতছড়িতে ছয়জন | ৪৫ |
| সীমান্ত ধরে বিচক্ষণানে ২৪০ কি.মি! | ৪৭ |
| গ্রগ সাইকেলিংয়ে লং রাইডের খুঁটিনাটি | ৪৯ |
| কেমন হবে ঈদের খাবার | ৫১ |
| পাহাড়ে র্যাপলিংয়ের রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা | ৫৫ |
| নারীদের নিরাপদ অঘণে লেডিবার্ড | ৫৭ |
| পর্যটন সংবাদ | ৫৯ |

দক্ষিণের পর্যটন শিল্পে নতুন সম্ভাবনা

জন্ম গতি

■ পর্যটন বিচিত্রা প্রতিবেদন

পদ্মা সেতু চালু হওয়ার পর দক্ষিণবঙ্গের পর্যটন শিল্পে নতুন সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। পর্যটন শিল্পের উন্নয়নে যোগাযোগ ব্যবস্থা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ফলে এই সেতু পর্যটন শিল্প বিকাশের সম্ভাবনাকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে বহুগুণ। পদ্মা সেতুর কারণে বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে ২১ জেলার সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থার বৈপ্লবিক পরিবর্তন হয়েছে। এই অঞ্চলে পর্যটন শিল্পের উন্নয়নও অনিবার্যভাবে হচ্ছে। দেশি-বিদেশি পর্যটকরা সহজেই নিজস্ব গাড়ি কিংবা গণপরিবহণে স্বল্প খরচে এবং স্বল্প সময়ে পদ্মা সেতু হয়ে সুন্দরবন এবং কুয়াকাটায় যেতে পারছেন। আন্তর্জাতিক পর্যটকরা বেনাপোল এবং ভোমরা বন্দর সাতক্ষীরা হয়ে কুয়াকাটা, সুন্দরবন দেখে রাজধানী ঢাকা হয়ে বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের পর্যটন আকর্ষণসমূহ অবলোকন করতে পারবেন।
দক্ষিণাঞ্চলের কুয়াকাটা ও সুন্দরবনসংলগ্ন ছোট ছোট দ্বীপ পর্যটন উপযোগী করা যাবে। কুয়াকাটা সমুদ্রসৈকত, সুন্দরবন ও পায়রা বন্দর ঘিরে দেখা দেবে পর্যটনের বিপুল সম্ভাবনা।
দক্ষিণ বাংলার গ্রামেও পরিবর্তনের হাওয়া লাগবে। এই অঞ্চলের কৃষক, মৎসজীবী, তাঁতি, ছেট ও মাঝারি ব্যবসায়ীরা বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় ভোক্তার সমাবেশ যে রাজধানী ঢাকা, তার সঙ্গে অন্যায়ে সংযুক্ত হতে পারবেন।
নতুন নতুন ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প-কারখানা, আবাসন প্রকল্প, রিসোর্ট, বিশ্ববিদ্যালয়, বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল, হাই-টেক পার্ক, মানবসম্পদ প্রশিক্ষণকেন্দ্র, রেস্টুরেন্ট ও নানা ধরনের এসএমই উদ্যোগ স্থাপনের ইডিক পদে গেছে। খুলনা ও বরিশালে জাহাজ নির্মাণশিল্পের প্রসার ঘট্টে শুরু করেছে। কুয়াকাটায় পর্যটনশিল্পের বিকাশ ঘটছে দ্রুতগতিতে। পদ্মা



দেশি-বিদেশি পর্যটকরা সহজেই নিজস্ব গাড়ি কিংবা গণপরিবহণে স্বল্প খরচে এবং স্বল্প সময়ে পদ্মা সেতু হয়ে সুন্দরবন এবং কুয়াকাটায় যেতে পারছেন। আন্তর্জাতিক পর্যটকরা বেনাপোল এবং ভোমরা বন্দর সাতক্ষীরা হয়ে কুয়াকাটা, সুন্দরবন দেখে রাজধানী ঢাকা হয়ে বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের পর্যটন আকর্ষণসমূহ অবলোকন করতে পারবেন।
দক্ষিণাঞ্চলের কুয়াকাটা ও সুন্দরবনসংলগ্ন ছোট ছোট দ্বীপ পর্যটন উপযোগী করা যাবে। কুয়াকাটা সমুদ্রসৈকত, সুন্দরবন দেখে রাজধানী ঢাকা হয়ে বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের পর্যটন আকর্ষণসমূহ অবলোকন করতে পারবেন। দক্ষিণাঞ্চলের কুয়াকাটা ও সুন্দরবনসংলগ্ন ছোট ছোট দ্বীপ পর্যটন উপযোগী করা যাবে।

আসবে। এছাড়া এই অঞ্চলের বিশেষ করে সুন্দরবন সংলগ্ন এলাকাগুলোতে কমিউনিউটি টুরিজমের ব্যাপক উন্নতি হবে।

দক্ষিণের পর্যটন বিকাশ

কুয়াকাটা একদিকে যেমন সমুদ্রের সৌন্দর্য উপভোগের সুযোগ করে দেবে অন্যদিকে খুব কম সময়ে সুন্দরবনের অন্যতম আকর্ষণীয় স্পট-কটিখালী, কটকা সৈকত, জামতলা সি-বিচ, সুন্দরবন সংলগ্ন সাগরে জেগে ওঠা দ্বীপ পক্ষীর চর, ডিমের চর ঘূরে দেখার অপার সুযোগ সৃষ্টি করেছে। কটকাতে হরিণপালের বিচরণ দেখতে অনেকেই ছুটে যান সেখানে। খুলনা শহর থেকে নদী পথে কটকা যেতে হলে সময় লাগে ১৫ ঘণ্টার মতো, আর মূল্য থেকে সময় লাগে ১২ ঘণ্টা। তবে কুয়াকাটা থেকে কটকায় পৌছাতে সময় লাগে মাত্র সাড়ে তিনি ঘণ্টার মতো। খুলনা থেকে ওই স্পটে যেতে হলে রাত্রিযাপন ছাড়া ফিরে আসা সম্ভব না। কিন্তু কুয়াকাটা থেকে সকালে গিয়ে কয়েক ঘণ্টা হরিণের সান্নিধ্যে কাটিয়ে সন্ধ্যায় ফিরে আসা সম্ভব।

কুয়াকাটা

কুয়াকাটার পশ্চিম দিকে সুন্দরবন যেমন পর্যটকদের





হাতছানি দেয় তেমনি পূর্ব দিকে ও রয়েছে পর্যটনের বিশাল ভাণ্ডার। যার কথা মাথায় এলেই পর্যটকদের মন আনচান করে ওঠে। কিন্তু সময়ের অভাবে যেতে পারেন না অনেকে। সেই পর্যটন ভাণ্ডার চর কুকরি মুকরি, ঢাল চর, চর নিজামও কুয়াকাটার হাতের নাগালেই।

ঢাকা থেকে রাতে গিয়ে দিনের বেলা ঘুরে পরের রাতেই ঢাকায় ফেরা স্বত্ব হবে। ছুটির দিনটি দারণভাবে উপভোগ করা যাবে সেখানে। আর যাদের সাঙ্গাহিক ছুটি শুরু-শনি, পন্দ্রা সেতু হলে তারা তো সোনায় সোহাগা। খরচও থাকবে সাধ্যের নাগালে।

শুধু কি সুন্দরবন, সাগরকল্যা কুয়াকাটার নিজেরও রয়েছে অপরূপ সৌন্দর্য। এখানে একদিকে যেমন রয়েছে সূর্যাস্ত উপভোগ করার সুযোগ, তেমনি রয়েছে অপরূপ সূর্যোদয়। রয়েছে সৈকতকেন্দ্রিক পর্যটকপ্রিয় কার্যক্রম। সৈকতের কিটকটে হেলান দিয়ে মুখে পূরতে পারবেন সাশ্রয়ী মূল্যে সামুদ্রিক মাছের ফ্রাই ও বারবিকিউ। বর্ষা মৌসুমে রাতের নির্জনতাকে একেড়ো-ওফেড়ো করে দেয় সাগরের গর্জন। প্রথমবার গেলে রীতিমতো বুকে কাঁপন ধরিয়ে দিতে সক্ষম সমুদ্রের গগনবিদারি ডাক। কুয়াকাটার গা ধৈঁমে অবিস্তিত ফাতারার চর, লাল কাকড়ার চর, শুঁটিকি পল্লি, লালদিয়ার চর, চর বিজয়, ফকিরহাট, সোনার চর, ক্র্যাব আইল্যান্ড বা কম কিসে? একটি স্পট থেকে আরেকটির প্রকৃতি ভিন্ন, রয়েছে ভিন্ন রকম জীব-বৈচিত্র্য। এক কথায় বলতে গেলে একটির চেয়ে আরেকটি বেশি আকর্ষণীয়।

পেয়ারা বাজার সেগুলোর মধ্যে একটি। পেয়ারার মৌসুমে এই ভাসমান বাজারে বেচাকেনা হয় সর্বোচ্চ।

ভাসমান পেয়ারার বাজারটি পিরোজপুরের নেছারাবাদ উপজেলার অস্তর্গত স্বরূপকাঠির কীর্তিপাশা খালের ওপর অবস্থিত। সাধারণত পেয়ারার মৌসুম শুরু হয় জুলাই মাসে, চলে টানা সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। তাই পাইকারি বাজারের দেখা পেতে হলে সেখানে যেতে হবে জুলাইয়ের শেষ দিকের সময়টাতে।

আগে ঢাকা থেকে পেয়ারা বাজারে যেতে সময় বেশি লাগত। তবে পদ্মা সেতুর কল্যাণে দুই দিনের যাত্রা শেষ করা যাবে একদিনেই। এখন মাত্র ৬ থেকে ৮ ঘণ্টার বাস যাত্রায় যাওয়া যাবে পিরোজপুরে। অর্থাৎ, খুব ভোরে রওনা দিলে দুপুরের মধ্যেই দেখা যাবে বাজারের জমজমাট পরিবেশ।

বিগত কয়েক বছরে স্বরূপকাঠির ভিমরলি গ্রামে পর্যটকদের আনাগোনা বেড়েই চলেছে। লঞ্চ যাত্রার জন্য, ঢাকা সদরঘাট থেকে রাত চট্টার সুরভী-৯ লঞ্চে গেলে বিকাল ৩ টার মধ্যেই পৌঁছানো যাবে বরিশালে। আর বাস যাত্রার জন্য, গাবতলী বাসস্ট্যান্ড অথবা অনলাইন থেকে টিকেট সংগ্রহ করে টুপিপাড়া এক্সপ্রেস, এমাদ পরিবহণ বাসে যাওয়া যাবে পিরোজপুরে।

খান জাহান আলীর মাজার ও ষাট গঙ্গুজ মসজিদ
দক্ষিণের আরেক পর্যটন গভর্ন্য হলো খুলনার বাগেরহাটের খান জাহান আলীর মাজার শরিফ। বাগেরহাট শহর থেকে মাত্র ৩ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে এবং খুলনা থেকে প্রায় ২২ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অবস্থিত। এছাড়া বাগেরহাট জেলার দক্ষিণ-পশ্চিমে বয়েছে ষাট গঙ্গুজ মসজিদ। এটি বাংলাদেশের একটি গ্রাচীন মসজিদ। আর খুলনা জেলার ফুলতলা উপজেলার দক্ষিণভিত্তিতে রয়েছে বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শুণুরালয়। এছাড়া খুলনা অঞ্চল মৃৎশিল্পের খুবই বিখ্যাত। কালের আবর্তে হারিয়ে যেতে বসা ঐতিহ্যবাহী এই শিল্প নতুন করে ঘুরে দাঁড়াবে ভালো যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে।

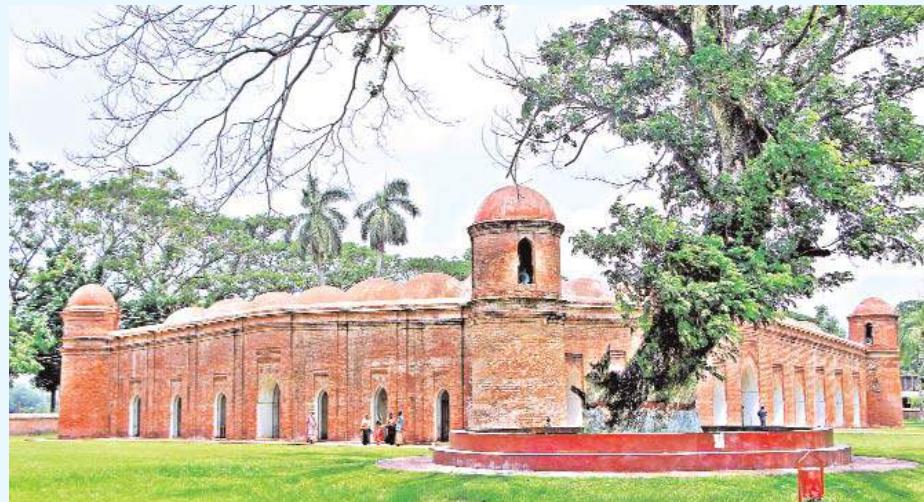
দক্ষিণে বিলাসবহুল বাসযাত্রা

রাজধানী ঢাকা থেকে সরাসরি সড়ক পথে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ২১ জেলার যোগাযোগের দ্বার উন্মোচিত হওয়ায় গাড়ির চাকার সঙ্গে ঘূরছে অর্থনৈতিক চাকা। পরিবহণ ব্যবসায়ীরাও চালু করেছেন নতুন নতুন বিলাসবহুল গাড়ি। রাজধানী থেকে সর্বোচ্চ সাড়ে ৪ ঘণ্টায় পৌঁছানো যাচ্ছে দক্ষিণের ২১ জেলায়। বেনাপোল স্থল বন্দর, ভেগমরা স্থল বন্দর, মংলা বন্দর, পায়ারা বন্দর পৌঁছানো যাচ্ছে সহজেই। এ ছাড়া কুয়াকাটা-সুন্দুরবনসহ পর্যটনখাতেও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

পদ্মা সেতুর জাজিরা প্রাপ্ত থেকে বরিশাল যাওয়া যাচ্ছে সর্বোচ্চ ২ ঘণ্টায়, খুলনা ও ঘণ্টায় আর ফরিদপুর যেতে সময় লাগবে ৪৫ থেকে ৫০ মিনিট।

সরাসরি বরিশাল থেকে ঢাকা যেতে সময় লাগছে মাত্র ৩ থেকে সাড়ে ৩ ঘণ্টা।

পদ্মা সেতুর সুবাদে ঢাকা-খুলনা রুটে যুক্ত হয়েছে বিলাসবহুল বাস। এ রুটে খুলনা থেকে বেশ কিছু নতুন বাস চালু হয়েছে। পদ্মা সেতু চালুর পরদিন থেকেই গ্রিন লাইন পরিবহণ খুলনা-ঢাকা রুটে চালু করেছে গুড়ি নতুন বিলাসবহুল দোতলা বাস।



এছাড়াও বিভিন্ন পরিবহণ সার্ভিস নতুন বাস চালু করেছে। তাছাড়া বিআরটিসিসহ বেশ কয়েকটি নতুন বাস সার্ভিস চালু করেছে।

গ্রিন লাইন ছাড়াও যেসব কোম্পানির বাস রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে ইলিশ, প্রচেষ্টা, এনা, সুপার সনি, গ্রিন সেন্ট মার্টিন, ইউনিক, দৈগলসহ অন্যান্য কোম্পানির বাস। সবগুলো বাসই শীততাপ নিয়ন্ত্রিত।

লঞ্চ যাত্রায় করুণ চিত্র

পাদ্মা সেতু উন্মোচনের বছর পার না হতেই মারাত্মক প্রভাব পড়েছে বরিশাল বিভাগের ১২টি নৌ-রুটে।

লঞ্চ চলাচলের বেশ কয়েকটি জনপ্রিয় রুট ইতোমধ্যে বন্ধ হয়ে গেছে। যাত্রী সংকটের মধ্যে রয়েছে বরগুনা-পটুয়াখালীর মত জনপ্রিয় রুটগুলো। এমনকি বরিশাল নদী বন্দরেও যাত্রীর খড়া নেমেছে।

লঞ্চ মালিকরা রোটেশন ব্যবস্থা চালু করে নিজেদের টিকিয়ে রাখার সর্বোচ্চ চেষ্টা চালালেও যাত্রী ফেরাতে পারছেন না।

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডিইটিএ) সুতে জানা যায়, ঢাকা-বরিশাল নৌরুট এবং অভ্যন্তরীণ ১১টি রুটের মধ্যে ভাস্তরিয়া, টরকি, বালকাটি এবং বরগুনা রুট যাত্রীর অভাবে

সামাজিক বন্ধ রাখা হয়েছে। এছাড়া পটুয়াখালীর ৬টি রুটের মধ্যে ৫টি বন্ধ হয়ে গেছে। পটুয়াখালী থেকে দিনে একটি লঞ্চ ঢাকার উদ্দেশে ছেড়ে গেলেও যাত্রীর সংকটে দৈদুল আজহার পরে সেটিও বন্ধ ঘোষণার সিদ্ধান্ত হয়েছে। বরগুনা থেকেও মাত্র একটি লঞ্চ ঢাকার উদ্দেশে ছাড়ে। সেখানেও যাত্রী সংকটে প্রতিদিনের খরচ উঠেছে না। পদ্মা সেতু চালুর পর যাত্রী সংকট হচ্ছে বলে লঞ্চ মালিকদের ভাষ্য।

এমতাবস্থায় লঞ্চ ব্যবসাকে টিকিয়ে রাখতে বিকল্প রুট খোঁজার পাশাপাশি লঞ্চকে পর্যটক বাহন হিসেবে ব্যবহারের পরিকল্পনা হাতে নিতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন পর্যটন বিশেষজ্ঞরা। এর সঙ্গে জড়িত সবার কর্মসংস্থানের সুষ্ঠির পাশাপাশি যাত্রী-বাহী লঞ্চকে পর্যটনবান্ধব করতে পারলে এই শিল্প ঘূরে দাঁড়াবে বলে মনে করছেন তারা।

পর্যটন বিশেষজ্ঞ মহিউদ্দিন হেলাল বলেন, পদ্মা সেতুর কারণে দক্ষিণবঙ্গের পর্যটন শিল্পে নতুন সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।

পর্যটন শিল্পের উন্নয়নে যোগাযোগ ব্যবস্থা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ফলে এই সেতু পর্যটন শিল্প বিকাশের সম্ভাবনাকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে বহুগুণ। তবে পরিকল্পিত উন্নয়ন ঘটাতে পারলে পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন হবে। ◆



ঢাকার পাঁচতারকা হোটেল শেরাটনে আপনাকে আমন্ত্রণ

পর্যটন সেবা

■ পর্যটন বিচিত্রা প্রতিবেদন

চেতে পেরিয়ে বৈশাখ এলো। সবে তো গ্রীষ্মকালের শুক্র। গরমে প্রাণ-মন-শরীর যেন অস্থির হয়ে ওঠে। অ্যাকুরিয়ামে সাঁতার কাটা মাছগুলোকে দেখে মনে হয়, ওরাই বেশ আছে। ইচ্ছে করে ওরকম গা ডুবিয়ে পরম শান্তি পেতে। আর এমন পরিবেশ পেতে পারেন



পাঁচতারকা হোটেল শেরাটনের রুফটপ সুইমিং পুলে। অপূর্ব দৃশ্যাবলী উপভোগ করতে করতে সুইমিং পুলের পানিতে গা এলিয়ে উপভোগ করতে পারেন অন্যরকম আমেজ। শান্তি আর স্বচ্ছতার মিশেলে চলে যাবেন অন্য এক জগতে। আর যারা সাঁতার জানেন না, তাদের জন্য আছে প্রশিক্ষকসহ সাঁতার শেখার ব্যবস্থা। প্রতি শুক্র ও শনিবারে পুরুষ ও নারী প্রশিক্ষকের তত্ত্ববধানে যারা সাঁতার শিখতে চান, তারা এই পরিষ্কৃত পরিবেশের সুবিধা নিতে পারেন। ৬ থেকে ১১, ১২ থেকে ২৫, ২৫ থেকে ৪৯ এরকম নানা বয়সের ভিত্তিতে এই সুবিধা নেয়া যাবে। তাপনিয়ন্ত্রিত এসব সুইমিং পুলে যে কোনো ঝুঁতেই

আরামদায়ক অনুভূতি অনুভব করা যাবে।

নয়নাভিন্নাম হোটেলটি সবার নজর কাড়ে সহজেই। স্থাপনার দিক থেকেও এটি স্থত্ত্ব। নির্মাণশিল্পী ও স্থাপত্যবিদ্যার কারিগরিতে হোটেলটি যেমন দৃষ্টিনন্দন, তেমনই আরামদায়ক। অবস্থানের দিক থেকেও এটি গুরুত্বপূর্ণ। রাজধানী ঢাকা এখন নতুন সাজে যেখানে সাজছে, সেই বনানীর কামাল আতাতুর্ক এভিনিউতে হোটেল শেরাটনের অবস্থান। শেরাটনের আভিজ্ঞাত্য আর ঐতিহ্য যেন এখানে কাছাকাছি দাঁড়িয়ে থেকে সবকিছুর সঙ্গে মিলেমিশে উজ্জ্বল উদাহরণের মতো দাঁড়িয়ে আছে। ঢাকায় শেরাটন নতুন সাজে স্থাপন করা হয়েছে বনানীতে। ইউনিক গ্রুপের ম্যানেজিং ডিপ্রেস্ট মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ নূর আলীর যত্ন ও তত্ত্বাবধানেই এটি সম্ভব হয়েছে। উনার তত্ত্বাবধানে হোটেল ওয়েস্টিনও পরিচালিত হচ্ছে। এসবের ধারাবাহিকতা বহন করছে আন্তর্জাতিক চেইন ‘ম্যারিয়ট ইন্টারন্যাশনাল’। এখনে আছে ২৪টি আবাসিক রুম যা সম্পূর্ণ শীতাত্প নিয়ন্ত্রিত। প্রত্যেকটি রুমই বিলাসবহুল। ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সংযোগ, টেলিভিশনে বিশ্বের সেরা চ্যানেলের সংযোগ, ব্যবসায়িক লেনদেনের সুব্যবস্থা রয়েছে গোচানোভাবে। এছাড়া রয়েছে ২৪ ঘণ্টা নিরাপত্তা ব্যবস্থা, রেন্ট-এ-কার, কুরিয়ার সার্ভিস, ২৪ ঘণ্টা চিকিৎসা ব্যবস্থা, ফ্রি পার্কিং। রয়েছে ড্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে বিল পরিশোধের সুযোগ। বিভিন্ন ব্যাংক কার্ডের মাধ্যমে লেনদেনে রয়েছে নানারকম সেবা গ্রহণের সুবিধা।

হোটেলের বিজেনেস সেন্টারে সেক্রেটারিয়াল কাজে সহযোগিতার জন্য রয়েছে টেলেক্স, ইমেইল, ফ্যাক্স, কম্পোজ, ফটোকপি এবং স্কাইরাল বাইন্ডিং সুবিধা। এছাড়া বিজেনেস সেন্টারে মিটিং করার জন্য সুযোগও রয়েছে। মিটিং প্লেসগুলো আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করার ফলে সেগুলো চমৎকারভাবে উপযোগী। প্রাণপ্রার্থে ভরা টি লাউঞ্জিংও কাছে টানবে। হালকা খাবার ও কফির সুবাস পাবেন এখানে। রয়েছে আলাদা চারটি রেস্টুরেন্ট ও বার। রফটপে সুইমিংপুলের কাছেই রয়েছে স্পেশাল জাপানিজ রেস্টুরেন্ট। মেখানে জাপানি ঐতিহ্যবাহী খাবার তৈরি করেন জাপানিজ শেফ। লবি লেভেল ৯-এ আছে কফি শপ। লেভেল ফোরটিনে আছে গার্ডেন কিচেন রেস্টুরেন্ট। ১৮টি ব্যাংক কার্ড ব্যবহার করে এখানে ‘বাই ওয়ান গেট ওয়ান ফ্রি’ সেবা উপভোগ করা যাবে। ৭৪১ স্থায়ার মিটারের ‘পিলারলেস’ গ্রান্ড বল রুমটি খুবই আকর্ষণীয়। ১৮টি আলাদা মিটিং প্লেসগুলো নানা কাজে ব্যবহার করা যায়। আছে ব্রাউডাল স্যুট, ফিটনেস সেন্টার ও স্পা।

হোটেল শেরাটন- এই নামটিই যেন অন্যরকম এক আবেদন নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে অতিথিদের জন্য। ঐতিহ্যবাহী এই পাঁচতারকায় আমন্ত্রণ জানাই। আরও বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করতে পারেন এই (+৮৮ ০২ ৫৫৬৬৮১১১) নাম্বারে। ◆



সবুজের শহরে আভিজাত্যের তোরণ

■ পর্যটন বিচিত্রা ডেক্স

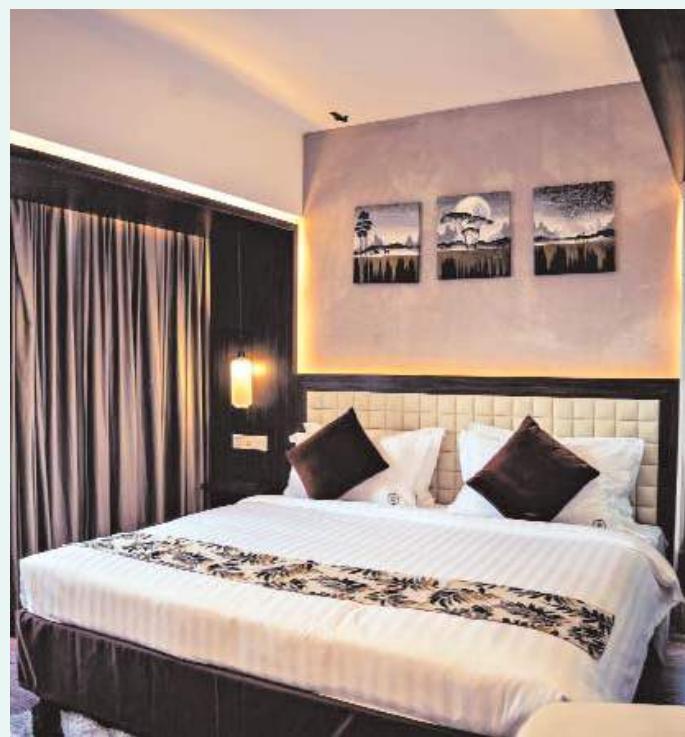
বিশ্বমানের সুযোগ সুবিধা, অনন্য সৌন্দর্য, মাঝদৃষ্ট মনোরম পরিবেশ- সব মিশে যেন এক রয়েছে উত্তরবঙ্গের প্রথম চার তারকা গ্র্যান্ড রিভারভিউ আবাসিক হোটেলে। এটি এই অঞ্চলের বিলাসি আভিযানের এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে। অত্যধূমিক কক্ষ, বিশ্বমানের সুবিধা আর মনকাড়া সৌন্দর্য গ্র্যান্ড রিভারভিউ হোটেলকে করে তুলেছে অন্য সবার থেকে আলাদা; যা দিতে পারে ব্যবসায়ী অথবা ভ্রমণকারীর কিছু সময় কাটানোর বা রাত্রিযাপনের এক ঘরোয়া পরিবেশ।

রাজশাহীর কাজিহাটায় অবস্থিত গ্র্যান্ড রিভারভিউ হোটেলের অসাধারণ কক্ষগুলোর প্রতিটিতে রয়েছে আধুনিকতার ছোঁয়া। এখানে সর্বাধুনিক আইপি ফোন থেকে শুরু করে ৪৮ ইঞ্জিনিয়ারিং টেকনোলজি, উচ্চগতির ওয়াই-ফাই সংযোগ, বিলাসবহুল জ্যাকুজি এবং রেইন শাওয়ারের মতো অত্যধূমিক সুযোগ সুবিধা রয়েছে। এছাড়া এখানে উপভোগ করতে পারবেন মিনিবারের বিশেষ সুযোগ সুবিধাগুলো। আপনার মূল্যবান জিনিসগুলো নিরাপদে রাখার জন্য রয়েছে ‘ইলেক্ট্রিক সেইফ বক্স’। চাইলে নিজেই প্রস্তুত করে নিতে পারবেন এক কাপ চা বা কফি অত্যধূমিক TCMF প্রযুক্তি ব্যবহার করে।

শুধু অত্যধূমিক প্রযুক্তিই নয়, সাংস্কৃতিক বিনোদনেরও সুযোগ পাবেন এখানে। অবসরে বিনোদনের জন্য রয়েছে বিশ্বমানের সিনেপ্লেক্স, ইনফিনিটি পুল। ফিটনেস সচেতনদের জন্য রয়েছে ‘হেলথ ক্লাবস জিম’, রয়েছে স্পা, স্টিম রুম। জমকালো অনুষ্ঠান ও সমাবেশের জন্য পাবেন হোটেলের গ্র্যান্ড বলরুম, কনফারেন্স হল। রাত্রিভাজনের জন্য রয়েছে প্রয়োজনীয় সুব্যবস্থা, যা আপনাকে ব্যক্তিগত আভ্যন্তরে করে তুলবে রোমাঞ্চকর।

ব্যক্তিগত রুক্ষনশিষ্ঠ এই হোটেলকে করে তুলেছে সবার থেকে আলাদা। হোটেলের ‘গ্লোবাল কুইজিন’ রেস্তোরাঁয় খাবার প্রেমিকরা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের খাবারের স্বাদ নিতে পারবেন। কফি লাউঞ্জের শাস্ত এবং স্লিপ পরিবেশ আপনাকে এনে দেবে প্রশান্তি। ভিন্ন ধাচের খাবারের জন্য আপনি যেতে পারেন ফুড কোর্টে।

স্বপ্নদ্রষ্টা ও তরুণ উদ্যোগী ইশ্বর্ফা খাইরুল হক শিমুলের ব্যবস্থাপনায় উত্তরবঙ্গের অত্যধূমিক ও বিলাসবহুল এই আবাসিক হোটেল স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক দর্শনার্থীদের জন্য একটি রোল মডেল হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করতে পারেন এই (+৮৮০১৮৭৭৬৬৯৬৬) নামাবে। ◆





সুন্দরবনে এমভি ক্রাউনে বিলাসী ভ্রমণ

মন্তব্য

■ পর্যটন বিচিত্রা ডেক্স

সুন্দরবন ভ্রমণে সম্পূর্ণ নতুন ধরনের ভ্রমণ অভিজ্ঞতা দিতে গত বছরের ডিসেম্বর মাস থেকে যাত্রা শুরু করে এমভি ড্যু ক্রাউন। সুন্দরবন ট্যুরিজম খাতে একেবারে ডিম্ব আস্পিকে নতুন কিছু তৈরির পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে ক্রাউন।

বিশেষ সবচাইতে বড় ম্যানগ্রোভ বন সুন্দরবনের কটকা, কচিখালি, হিরণ পয়েন্ট, দুবলুর চর, হারবারিয়া এবং করমজল ইত্যাদি নৈসর্গিক স্থান ঘুরে দেখতে বেঁচে নিতে পারেন সুন্দরবনের নতুন সর্বাধুনিক ও বিলাসবহুল জাহাজ এমভি ক্রাউন। এবার সৈদে ছুটিতে ঘুরে আসতে পারেন সুন্দরবন। সৈদ উপলক্ষ্যে বিশেষ প্যাকেজ ঘোষণা করেছেন এমভি ক্রাউন।

ভ্রমণের তারিখ: ২৪ -২৬ এপ্রিল, ২০২৩

ভ্রমণের সময়কাল: ২ রাত এবং ৩ দিন

ভ্রমণের রুট: খুলনা-সুন্দরবন-খুলনা

ভ্রমণের স্পট: হাড়বারিয়া, জামতলা সি-বিচ, কটকা, টাইগার পয়েন্ট, কচিখালি, ডিমের চর এবং করমজল ইত্যাদি।

জাহাজের রুমের বিন্যাস ও সুবিধা

এমভি ক্রাউন জাহাজে রয়েছে ২৮টি আধুনিক ও সুসংজ্ঞিত রুম। রুমগুলোতে মোট ৭৫ জন যাত্রী আরামে থাকতে পারবেন এবং রুমগুলো দুই শ্রেণিতে বিভক্ত-

* প্যানোরামা রুম (২০০০০ টাকা জনপ্রতি)।

প্যানোরামা রুমগুলোতে থাকবে ১৮০ ডিগ্রি রিভারভিউ সুবিধা ও যাত্রীদের চাহিদা অনুযায়ী বেশ কয়েক ধরনের ধারণ ক্ষমতা অনুযায়ী রুমগুলো সাজানো হয়েছে। যেমন-

Panorama Deluxe (২ জনের জন্য)

Panorama Triple (৩ জনের জন্য)

Panorama Triple Plus (৩ জনের জন্য)

Panorama Excel (৪ জনের জন্য)

Panorama Ultra (৪ জনের জন্য)

* স্টেট রুম (১৮০০০ টাকা জনপ্রতি)। স্টেট রুমগুলি জাহাজের নিচের ডেকে অবস্থিত এবং এগুলোতে পাওয়া যাবে নিরবিলি ও আরামদায়ক পরিবেশ। স্টেট রুমগুলো ধারণক্ষমতা অনুযায়ী দুই ধরনের। যেমন-

State Deluxe (২ জনের জন্য)

State Triple (৩ জনের জন্য)

জাহাজের প্রত্যেকটি রুমে একই ধরনের সুযোগসুবিধা নিশ্চিত করা হয়েছে। যেমন-আধুনিক

অভ্যন্তরীণ সাজসজ্জাসহ প্রশস্ত রুম, প্রতিটি রুমে আলাদা শৌতাত্প নিয়ান্ত্রণের ব্যবস্থা, আরামদায়ক বিছানা, সোফা ও আয়না, ইন্টারকম সুবিধা, ১৪ ঘন্টা রুম সার্ভিস, ব্যাগ/লাগেজ সংরক্ষণের জন্য কেবিনেট, প্রতিটি রুমে স্যাটেলাইট টেলিভিশন, ইন্টার কানেক্টিং রুম, অ্যাটাচড ওয়াশরুম, ওয়াশরুমে নরমাল ও হট ওয়াটার সাপ্লাই।

সাধারণ বৈশিষ্ট্য ও বিন্যাস

জাহাজের প্রত্যেকটি ফ্লোর সুপরিকল্পিতভাবে ডিজাইন করা। যাত্রীদের ওঠানামা, চলাচল এবং



ভূমগ উপভোগের কোনো স্থানেই দৃশ্যমান নেই। জাহাজের কোনো যান্ত্রিক অথবা স্টাফ ইউনিট। আরও সহজ করে বললে জাহাজের ইঞ্জিন রুম, স্টাফ রুম অথবা কিচেন রুম সবকিছুই থাকবে যাত্রীদের নজরের বাইরে। জাহাজে প্রবেশের জন্য থাকছে দুটি এন্ট্রি পয়েন্ট/প্রবেশাধার, যেগুলো রয়েছে মেইন ডেকের পেছনে এবং সামনের দিকে। মেইন ডেকে সার্বক্ষণিক যোগাযোগের জন্য একটি রিসিপশন ডেস্ক। জাহাজের মধ্যবর্তী স্থানে প্রশস্ত করিডোর এবং প্রত্যেকটি ফ্লোরে ওঠানামার জন্য সিঁড়ি। রয়েছে প্রেমার রুম বা নামাজের স্থান। গেস্ট রুমের সর্বোচ্চ প্রাইভেটি নিশ্চিত করার জন্য মেইন ডেক এবং লোয়ার ডেকে নেই কোনো কমন বারান্দা।

জাহাজের লোয়ার ডেকে রয়েছে দুই ধরনের স্টেট সিরিজের ১৪টি রুম এবং শিশুদের জন্য প্লে জোন। রয়েছে অভিজ্ঞ শেফ দিয়ে সুস্থানু খাবারের ব্যবস্থা। একইসাথে ৭০ জনের অধিক অতিথির খাবারের ব্যবস্থা রয়েছে। ৮০ জনেরও অধিক অতিথি নিয়ে সেমিনার আয়োজনের ব্যবস্থা রয়েছে। সার্বক্ষণিক চাও কফির ব্যবস্থা। জুস কর্নার। লাইভ বার-বি-কিউয়ের ব্যবস্থা।

আরও যেসব সুবিধা রয়েছে- মাল্টিমিডিয়া সেটআপ, আধুনিক সাউন্ড সিস্টেম, ডিজে সেটআপ ইত্যাদি। এছাড়া ডেক ও মেইন ডেক থেকে সুন্দরবন উপভোগের জন্য প্রচুর খোলা জায়গা এবং বসার ব্যবস্থা। গুরু আভ্যন্তর জন্য আরামদায়ক স্থান। রিডিং কর্নার। মিউজিক কর্নার। সিটিং সুবিধাসহ সুইমিং পুল। শিশুদের জন্য জন্য লোয়ার ডেকে রয়েছে সুড়শ্য প্লে জোন।

নিরাপত্তা ব্যবস্থার জন্য সব কমে রয়েছে লাইফ জ্যাকেট, পর্যাণু লাইফবেয়া, ফার্স্ট এইড বক্স। আধুনিক অগ্নিবিপক্ষ ব্যবস্থা। টুর্য প্যাকেজ সংক্রান্ত বিস্তারিত জানতে এবং বুকিং করতে কল করতে পারেন নিচের নম্বে-

+৮৮০১৫৫০৬৯৯৭৩৩, +৮৮০১৫৫০৬৯৯৭৩২
(ঢাকা অফিস)
+৮৮০১৭১২৮৬৩০৮, +৮৮০১৫৫০৬৯৯৭৩৪
(খুলনা অফিস) ◆





পদ্মায় হারানো স্থাপনার সন্ধানে

পর্যটন বিচিত্রিণা

■ মার্জিয়া লিপি

হেমন্তের সকাল। দৈনিক পত্রিকার শিরোনামে জানতে পারি, পদ্মা নদীতে সন্ধান মিলেছে হারানো স্থাপনার। সেবার অফিসের কাজে যেতে হয়েছিল পদ্মা নদী আর রেশমের শহর রাজশাহীতে। উপশহর থেকে পদ্মা নদীতে হারানো স্থাপনার সন্ধানে বের হই সেই কাক ডাকা ভোরে। যদিও গন্তব্য আরও অনেক দূরে, পাবনার মোকসেদপুর। কয়েক মাস আগে পত্রিকায় প্রকাশিত ছবি দেখে মনে উঁকি দেয় আগ্রাহ আর কোতুল। বিশাল পদ্মাতে ডুবে থাকা স্থাপনা-পুরাকৃতির ছাদে দাঁড়িয়ে জেলেরা জাল দিয়ে মাছ ধরছে। প্রমত্ন পদ্মায় হাঁটুপানি। বিস্ময়কর!

ভাবছিলাম, হয়তো এখানেও থেকে যেতে পারে ওয়ারী বটেশ্বরের মতো কোনো বিলুপ্ত জনপদ, নগরী অথবা ভূমিকম্পের মতো দুর্ঘাগে পুরাকৃতি পানিতে ডুবে আছে। অস্ত্রে কিছুই না- ইতালির ঐতিহাসিক নগরীর অর্ধেকাংশ এরকম দুর্ঘাগে ডুবে গেছে সমুদ্রের পানিতে।

শহর থেকে একটু গাঁথের দিকে গেলেই টের পাওয়া যায় হেমন্তের সঞ্চার। ঝাতুসন্দির এই কালে একদিকে জুলে রাতের আকাশ প্রদীপ, অপরদিকে দিনের বালমলে রোদ। মেঘের চালচিত্রে প্রকৃতির সবুজ আভা ছড়িয়ে থাকে বিকেলের মাঠে মাঠে। অন্তময় সন্ধ্যা কখনো কখনো ঢাকা পড়ে হালকা কুয়াশায়। হেমন্তে আকাশ থাকে নীল। নীল আকাশজুড়ে থাকে মেঘের আনাগোনা। পরিবেশ থাকে শীতের শৈতান আর গ্রীষ্মের মাঝামাঝি। তাই এ সময়ে ভ্রমণে সুখ পাওয়া যায়। পাকশীতে সন্ধ্যারাতে যাসে ঢাকা বোপঝাড় থেকে ভেসে আসা একটানা বিঁাৰ্বী পোকার ডাক আর জোনাকির আলো এক রকমের মায়া ধরিয়ে দেয়। জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের কাছে হেমন্ত স্বতন্ত্র ঝাতু নয়- শরতেরই অংশ। তারপরেও কার্তিক, অগ্রহায়ণের আকাশ তারায় তারায় ভরে যায়। তারা চেনার উপর্যুক্ত কালের নাম এই হেমন্ত। একসাথে আকাশের যত বেশি অংশ দেখা যায় ততই

তারা চেনার সুবিধা। হেমন্তের আকাশে সন্ধ্যায় জেগে ওঠে নক্ষত্রমণ্ডল। এ সময় তারা চেনা থাকলে আকাশ দেখতে মন্দ লাগে না।

পূর্ণিমা রাতের পদ্মা অন্যরকম। মনে আলাদা

বাঘা মসজিদকে ঘিরে রয়েছে নানা রকম কিংবদন্তি। শোনা যায়, নির্মাণকাজের এক পর্যায়ে সন্ধ্যায় গম্বুজের কাজ অসমাপ্ত রেখে রাজমিস্ত্রিরা চলে যান। কিন্তু পরদিন সকালে দেখা যায় গম্বুজটি পূর্ণ সমাপ্ত অবস্থায়। হ্যারত শাহদৌলাহ ও ৫ জন আতীয়ের মাজার মসজিদের সাথেই। আরেক পাশে রয়েছে বিশাল সাগরের মতো দীঘি। কিংবদন্তি রয়েছে- অনেক বছর আগে দীঘিতে রক্ষিত বিশাল হাড়ি ও বাসনপত্রে রান্না ও খাওয়ার পর চলতো ওরসের মেলায়। ওরস শেষে হাড়ি ও বাসনপত্র দীঘিতে ফেরত দিয়ে দিতে হতো। এ রকমই রেওয়াজ ছিল। এভাবেই চলতে থাকে বছরের পর বছর। কিন্তু কলিকালে- এখন আর এমনটি হচ্ছে না।

অনুভূতি সঞ্চারিত হয়। এক টুকরো মেঘ এসে জ্যোত্স্না দেকে দিলে জোড়াসেতুকে তখন আবছ আঁধার দেকে ফেলে। তাতে কলমায় বিচ্ছিন্ন

ফুটে ওঠে। যদিও সেই রূপ দেখার লোকের সংখ্যা ক্রমশ কমে আসছে। তারপরও পেপার মিলের পাস্পিং স্টেশনের কাছে গোল চতুরে অনেককেই বসে থাকতে দেখা যায়। নির্জনতায় কয়েকটি প্রহর কাটিয়ে যায় পর্টটকরা। রূপসী পাকশী যেন একেক ঝাতুতে একেক রকম রূপটান মেথে বসে থাকে রমণী। পদ্মার নিস্তরঙ্গ মেজাজ অন্তর্ব করা যায় হেমন্ত ও শীতকালে। এ সময় পানীন্তে টান ধরা রেখা দেখা যায়, পানির রাগ থাকে না। বর্ষায় নদীর মাঝে প্রবল হ্রাসে নাভি সুষ্ঠি হয়- যা দেখে ভয় লাগে। হেমন্তের হাওয়ায় বিকেলে পদ্মার বুকে নৌকা ভ্রমণ মানেই পাকশী। জোড়াসেতুর ভেতর দিয়ে সুর্যাস্ত দেখতে দেখতে তামায় হয়ে যেতে হয়। ছুটির দিনে এখানে অবকাশ যাপন মন্দ লাগে না।

আজকের দিনে অনেকের সাথেই পদ্মা নদীর পরিচয় বা সাক্ষাত হয়। ট্রেন্যাত্রী হয়ে হাতিঙ্গ সেতু পেরিয়ে বা লালন শাহ সেতু থেকে যানবাবানে চেপে যেতে যেতে এক বালক নদী ও সেতু দেখা হয়ে যায়। অবশ্য ভাড়াটে নৌকায় বসে উজানে বা ভাটিতে ভেসে খাওয়ার সময় পদ্মার পানি ছুঁয়ে ছুঁয়ে দুই তীর প্রত্যক্ষ করার অভিজ্ঞতা একেবারেই আলাদা।

নদীতে আগের মতো আর রকমারি নৌকার চলাচল নেই। লঞ্চ বা ফেরিও চলে না। অথচ এক সময় অসংখ্য নৌযান নদীর বুক চিড়ে চলাচল করতো। ২০০৪ এর মাঝামাঝি পর্যন্ত ফেরিও চলেছে। লালন শাহ সেতু চালুর পর এখন আর নদীর বুকে ব্যক্ততা নেই। কেবল গোটা কতক ডিঙি নিয়ে জেলেরা মাছ শিকারে ভাসে। যদি আকাশের দিকে দৃষ্টি তোলা যায়, তাহলে খালিক দার্শনিক ভাব আসে বিস্ময়কর সৌন্দর্যের চমকে। দিগন্তের ফিকে নীলে থোকা থোকা মেঘ ভেসে যায়। হেমন্তের দিনের বেলায় আকাশে তেমন রঙিন মেঘের সমাগম ঘটে না। হেমন্তের আকাশ যেন সূর্যবৎ জোড়াসেতুকে গাঢ় আলিঙ্গনের জন্য মেঘাবরণ ছায়ার আঁচল ছড়িয়ে দেয়। নিসর্গের মেঘমাত্রিক সৌন্দর্য ইতিহাস,



অভিজ্ঞতা মিলে পাকশী অনুভবযোগ্য স্থান। সূর্য উঠার পর পরই একরাশ উভেজনা ও অ্যাডভেঞ্চারের কল্পনা নিয়ে পদ্মা নদীর উপস্থিতি থেকে একটা ছোট সাদা গাড়িতে চেপে বসি। যাত্রাপথের সবকিছুই কল্পনার রঙে একের পর এক জাল বুনে যাচ্ছে- গাছ, লতা-পাতা দৃষ্টিসীমার সবকিছু দিয়ে। শহরের কোলাহলকে পাশ কাটিয়ে কাজলা, মতিহারের রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সবুজ চতুরকে বাঁ দিকে রেখে এগিয়ে চলি; ঘড়ির কাটার সাথে পাল্লা দিয়ে। চলতি পথ ধরেই রেশম উন্নয়ন বোর্ড। সিঙ্কের জন্য বিশেষ খ্যাত এই বিভাগীয় শহর। চোখজুড়ে আছে সোনালী রেশম পোকা থেকে সুতা বের করা হয়। শুক্রকীট হতে মথ পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে রেশম পোকার জীবন চক্র। নির্দিষ্ট বয়সে রেশম গুটি পানিতে সিদ্ধ করে সুতা বের করা হয়। রেশম পোকার জীবন যেন ‘আপান মাংসে হরিণ বৈরী’। লালা নিঃসৃত কষ বা সোনালী রেশমী সুতার কারণে বিসর্জিত হয় রেশম পোকার জীবন। কালো পিচের রাস্তা দিয়ে এগিয়ে যেতে থাকি। দর্শনীয় নতুন কিছু দেখতেই গাড়িচালক মাঝান ভাইয়ের কাছ থেকে জেনে নিই ‘এ কথা ও কথার’ আদি অন্ত। ঢাকা নগরীর ব্যস্ততা এখানে কোথাও নেই। সময়ের সাথে গতি ছন্দ রেখেই চলছে। নেই কোনো যানজট, হৈচৈ যাতে ছন্দপতন হয় ভাবনার। ভাবছিলাম মনে মনে, এখানে জীবন অনেক সহজ, সতেজ আর নিয়ন্ত্রিত। ঘটাখানেক পথ চলার পর হাঁওই দৃষ্টি চলে যায়, লাল টেরাকোঠার পুরনো স্থাপনার দিকে। একেবারে হাইওয়ের পাশেই বাধা মসজিদ কমপ্লেক্স। রাখার উপর কিছু দোকান পাট, চায়ের স্টল, দর্শনার্থীর জটলা। গন্তব্য যদিও আরও দূরে, যেতে হবে সেই মোকসেদপুর। কিন্তু একবার চোখে পড়ার পর মনে হলো, এখনই দেখে নিই। যদি ফেরার পথে সুর্যের আলো না থাকে, তাহলে প্রায় পাঁচশত বছরের পুরনো স্থাপনার অনেক কিছুই থেকে অদেখা, অধরা থাকবে। রীতিমতো আশ্চর্য রকম সৌন্দর্য। এখনো অনেক বেশি আনকোরা,

টেরাকোঠা স্থাপনাটি। বাধা মসজিদ কমপ্লেক্স ধরে সামনে, পাশে, চারপাশে দেখছি অবাক করা মগ্নমুদ্রণ দৃষ্টিতে। এক সময় নাকি বাধায় গভীর বন জঙ্গলে বাধের দেখা মিলতো। বিভাগীয় শহর রাজশাহী থেকে ২৪ কি.মি দক্ষিণ পূর্বে বাধা ওয়াকফ এন্টেরের সদর দপ্তর। উপমহাদেশের অনেক জাহাগর মতোই সভ্যতার প্রস্তর হয় এখানে নদীর ধারে। বাংলার সুলতান গোড়ের শাসন আমালে ১৫২৩ খ্রিষ্টাব্দে নসরত শাহ বাধা মসজিদ নির্মাণ করেন। ছোট স্বতন্ত্র লাল ইটে নকশা করায় আরবি ক্যালিগ্রাফের শিলালিপির টেরাকোটা এই মসজিদের অনন্য বৈশিষ্ট্য।

বাধা মসজিদকে ঘিরে রয়েছে নানা বকম কিংবদন্তি। শোনা যায়, নির্মাণকাজের এক পর্যায়ে সন্ধ্যায় গম্বুজের কাজ অসমাপ্ত রেখে রাজমিস্ত্রিরা চলে যান। কিন্তু পরদিন সকালে দেখা যায় গম্বুজটি পূর্ণ সমাপ্ত অবস্থায়। হ্যারত শাহদোলাহ ও ৫ জন আত্মীয়ের মাজার মসজিদের সাথেই। আরেক পাশে রয়েছে বিশাল সাগরের মতো দীঘি। কিংবদন্তি রয়েছে- অনেক বছর আগে দীঘিতে রাঙ্কিত বিশাল হাড়ি ও বাসনপত্রে রান্না ও খাওয়ার পর্ব চলতো ওরসের মেলায়। ওরস শেষে হাড়ি ও বাসনপত্র দীঘিতে ফেরত দিয়ে দিতে হতো। এ রকমই রেওয়াজ ছিল। এভাবেই চলতে থাকে বছরের পর বছর। কিন্তু কলিকালে- এখন আর এমনটি হচ্ছে না।

লোক মুখে শোনা কথা, হয়তো কারো বিশ্বাস ভঙ্গের কারণে এমনটি হয়েছে, দীঘিতে ফেরত দেওয়া হয়নি হাড়ি ও বাসনকোসন। ওরসের সময় ছাড়াও প্রায়ই মানত হিসেবে দূর দূরান্ত থেকে টাকা, ছাগল, মোমবাতি, আগরবাতিসহ আরও অনেক কিছু নিয়ে আসেন ভক্তবন্দ। এরকম কয়েকজনের দেখাও মিললো বাধা মসজিদ প্রাস্তরে। মহাসড়কের পাশে ৪৮৭ বছরের পুরনো বাধা মসজিদ কমপ্লেক্স যা বর্তমানে প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগের সংরক্ষণে রয়েছে। মসজিদের স্থাপত্যরীতির সাথে মিল রেখে নির্মিত

হয়েছে তোরণ যার পাশে সিঁড়ি দিয়ে নেমে বাধার বিশাল দীঘি। বসে থাকা স্থানীয় কয়েকজনের কাছে জিজেস করে জানতে পারি, অল্প দূরে পদ্মা নদীতে ডুবে থাকা পুরাকীর্তির কথা। খুব উচ্চসিত হয়ে চায়ের দোকানে বসে থাকা দুই তিনজন স্থানীয় ভাষায় বলছিলেন- ‘আফা, আফনে কোন পত্রিকার লোক?’ তারা ধরেই নিয়েছে আবারও পানিতে ডুবে থাকা পুরাকীর্তি পত্রিকায় খবর হতে যাচ্ছে। হাতে সময় কম থাকায় আড়াটা খুব একটা জমে ওঠে। বলতে বলতে বলতেই কল্পনার জালে হারানো ইতিহাস বার বারই যেন আটকাচ্ছিল। একেবারে বাংলাদেশের অন্যান্য পাড়াগাঁয়ের ভ-দশ্য, সবুজ, শ্যামল, নিরব, স্থিঞ্চ। আশপাশের জামিতে হাল দিচ্ছে বাস্ত কৃষ্ণাগ, কোথাও ধান কাটার পর খালি জমি পড়ে আছে, পাশে কিছু ফেলে যাওয়া ধানের বিছানিসহ। একপাশে ক্ষেত্রে আল ধরে সারি সারি কলাগাছ। পথের পাশেই একটা গরুর পিঠে কালো ফিঙে বসে আছে, লেজ দিয়ে বার বার ফিঙেটিকে তাড়ানোর দশ্য। কোথাও ফসল বোনার জন্য সমান দূরত্বে উঁচু করে মাটির টেক্যুরের পর টেক্ট। সবুজ ঘাসের উপর হলুদ প্রজাপতির চক্ষল ডানায় ভর করে উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে। মাটির পথ ধরে কিছু দূরে ছোট চাতালে ধৰ্বধৰে সাদা কয়েকটি বক ডানা মেলে উড়ছে কীসের সন্ধানে কে জানে? তবে এক সময় প্রম্ভ পুনরাবৃত্তির কোনো চিহ্ন দেখতে পেলাম না। একপাশে নদীর চর, ধানক্ষেত, নদীতে জাল দিয়ে মাছ ধরায় ব্যস্ত জেলে। কল্পনায় মিলিয়ে দেখছিলাম- মাঝানদীতে জেলে পুরাকীর্তির ছাদে দাঁড়িয়ে জাল মেলে মাছ ধরছে। জেলেরাও জানালেন এমনটিই করছিলেন তার চৈতে বৈশাখ মাসে যখন নদীর পানি কম ছিল। মাছ ধরা ছাড়াও প্রায়ই তখন শ্যামলা ধরা ছাদের পাশে দাঁড়িয়ে হাত স্পর্শ করছিলেন পুরাকীর্তির দরজ জানালায়। লেখক : গবেষক ও পরিবেশবিদ ◆



ছুটির দিনে ঘুরে আসুন আহসান মঞ্জিল

■ পর্যটন বিচিত্র ডেক্স

ঢাকার কয়েক শ' বছরের ইতিহাস-এতিহ্য ধারণ করে এখনো যে ক্যাটি স্থাপনা টিকে আছে আহসান মঞ্জিল তার অন্যতম। ঢাকার ইতিহাস-এতিহ্য নিয়ে যেসব প্রকাশনা আছে তার প্রায় সবখানেই এর বর্ণনা রয়েছে। আহসান মঞ্জিল পুরান ঢাকার ইসলামপুরের কুমারটুলী এলাকায় বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত। এটি পূর্বে ছিল ঢাকার নবাবদের আবাসিক প্রাসাদ ও জমিদারির সদর কাচারি। বর্তমানে এটি জাদুঘর হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

পুরান ঢাকার ঐতিহাসিক এই স্থানে প্রতিদিনই রয়েছে ভ্রমণপিয়াসীদের আনাগোনা। এ ছাড়া ছুটির দিনে হাজারো মানুষের ঢল নামে নবাব আমলের এই স্থাপত্য দেখতে। ঢাকা শহরের মতো ব্যস্ত শহরে নিঃশ্঵াস ফেলার জায়গার অভাব। কিন্তু আপনি চাইলেই আহসান মঞ্জিলের মতো একটি ঐতিহাসিক স্থানে ঘুরে আসতে পারেন।

পুরান ঢাকার পাট্যাটুলীর রাস্তাটা বেশ প্রশংসন। ঘিরি অলিগলি পার হওয়ার ঝামেলা এখানে খুব একটা পোহাতে হয় না। বামে মোড় নিয়ে ওয়াইজ়াটের রাস্তা ধরে হাতের বামে বুলবুল লিলিকলা একাডেমি ফেলে সোজা তাকালে চোখে পড়বে একটি লাল রঙের প্রাসাদ। এটিই আহসান মঞ্জিল। কাছে গিয়ে টিকিট কেটে ঢুকলেই বিশাল উদ্যান। অনেক রকমের ফুলগাছ, পাতাবাহার, নারিকেল আর সুপারিগাছে ভরা সবুজ অঙ্গন। মনমাতানো প্রাকৃতিক

পুরান ঢাকার ঐতিহাসিক এই স্থানে প্রতিদিনই রয়েছে ভ্রমণপিয়াসীদের আনাগোনা। এ ছাড়া ছুটির দিনে হাজারো মানুষের ঢল নামে নবাব আমলের এই স্থাপত্য দেখতে। ঢাকা শহরের মতো ব্যস্ত শহরে নিঃশ্বাস ফেলার জায়গার অভাব। কিন্তু আপনি চাইলেই আহসান মঞ্জিলের মতো একটি ঐতিহাসিক স্থানে ঘুরে আসতে পারেন।

সৌন্দর্য। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি বুড়িগঙ্গার তীর ঘেঁষে তখনকার জামালপুর পরগনার (বর্তমান ফরিদপুর-বরিশাল) জমিদার শেখ ইনায়েতউল্লাহ রংমহল প্রতিষ্ঠা করেন। তার মৃত্যুর পর জমিদারের ছেলে শেখ মতিউল্লাহ এটি ফরাসি বণিকদের কাছে বিক্রি করে দেন। ১৮৩৫ সালের দিকে বেগম বাজারে বসবাসকারী

নবাব আবদুল গনির বাবা খাজা আলীমুল্লাহ এটি কিনে নিয়ে বসবাস করতে শুরু করেন। ১৮৭২ সালে নবাব আবদুল গনি নতুন করে নির্মাণ করে তার ছেলে খাজা আহসানউল্লাহর নামে ভবনের নামকরণ করেন আহসান মঞ্জিল।

এটি একটি দোতলা ভবন। বারান্দা ও মেঝে মার্বেল পাথরে তৈরি। প্রতিটি কক্ষের আকৃতি অষ্টকোণ। প্রাসাদের ভেতরটা দুই ভাগে বিভক্ত। পূর্বদিকে বড় খাবার ঘর। উত্তরদিকে লাইব্রেরি। পশ্চিমে জলসাধন। পুরো ভবনের ছাদ কাঠের তৈরি। নিচতলায় খেলার ঘরে রয়েছে বিলিয়ার্ড খেলার জন্য আলাদা জায়গা। দরবার হলটি সাদা, সবুজ ও হলুদ পাথরের তৈরি। দোতলায় বৈঠকখানা, গ্রন্থাগার আর তিনটি মেহমান কক্ষ। পশ্চিম দিকে আছে নাচঘর আর কয়েকটি আবাসিক কক্ষ। আহসান মঞ্জিলের ৩১টি কক্ষের মধ্যে ২৩টি কক্ষ বিভিন্ন প্রদর্শনীর জন্য, নয়টি কক্ষ লক্ষনের ইতিয়া অফিস লাইব্রেরি থেকে প্রাণ্ত ফ্রিজকাপ কর্তৃক ১৯০৪ সালে তোলা ছবির সঙ্গে মিলিয়ে সাজানো হয়েছে। আহসান মঞ্জিলের তোষাখানা কোকারিজ কক্ষে থাকা তৈজসপত্র এবং নওয়াব এস্টেটের প্রোগ্রাম অফিস এডওয়ার্ড হাউস থেকে প্রাণ্ত বিভিন্ন নির্দর্শন সংরক্ষণ করে প্রদর্শনের জন্য রাখা হয়েছে আহসান মঞ্জিল জাদুঘরে। আহসান মঞ্জিল জাদুঘরে সংগৃহীত নির্দর্শন সংখ্যা চার হাজার সাতটি। এই ভবনটি ১৮৮৮ সালে প্রবল দুর্ঘটনায় ও ১৮৯৭

সালে ভূমিকম্পে বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আহসান মঞ্জিলই ঢাকার প্রথম ইট-পাথরের তৈরি স্থাপত্য। যেখানে প্রথম বৈদ্যুতিক বাতির ব্যবস্থা হয় নবাবদের হাতে।

মঞ্জিলের স্থাপত্যশৈলী পশ্চিমাদের সব সময়েই আকৃষ্ট করত। লর্ড কার্জন ঢাকায় এখানেই থাকতেন। বাংলাদেশ সরকার আহসান মঞ্জিলকে জাদুঘর হিসেবে সংরক্ষণ করে। ১৯৯২ সালে এটি জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়।

যা দেখতে পাবেন

গ্যালারি ১: এখানে আহসান মঞ্জিলের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি আলোকচিত্র ও চিত্রকর্মের সাহায্যে তুলে ধরা হয়েছে। এ ছাড়া আছে ভবনের একটি মডেল।

গ্যালারি ২: বিভিন্ন সময়ে ভবনের যে বিবরণ হয়েছে তা আলোকচিত্রের সাহায্যে প্রদর্শন করা হয়েছে এখানে। এ ছাড়া আছে কাটগ্লাস ও বাড়োভিতির নমুনা।

গ্যালারি ৩: নবাবদের আনুষ্ঠানিক ভোজন কক্ষ। এখানে প্রদর্শিত হয়েছে আলমারি, আয়না, কাচ ও চিনামাটির তৈজসপত্র। সবই আহসান মঞ্জিল থেকে প্রাপ্ত নির্দশন।

গ্যালারি ৪: বড় কাঠের সিঁড়ি। হাতির মাথার কক্ষাল, ঢাল-তলোয়ার। কাঠের বেড়ার মূল নির্দশন।

গ্যালারি ৫: আসল ঢাল-তলোয়ারের অনুরূপে সাজানো।

গ্যালারি ৬: আহসানউল্লাহ মেমোরিয়াল হাসপাতালের বেশকিছু ব্যবহৃত সরঞ্জামাদি ও খাতাপত্র এই কক্ষে প্রদর্শিত হয়েছে।

গ্যালারি ৭: এই বড় কক্ষটি নবাবদের দরবার হল হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগ গঠনের সময় শাহবাগের

সঙ্গে আসা সর্বভারতীয় মুসলিম নেতাদের তৈলচিত্র এই

গ্যালারিতে স্থান পেয়েছে। এ ছাড়া আছে ঢাকার

নবাবকে ইতালি থেকে দেওয়া একটি অষ্টকোণ টেবিল।

গ্যালারি ৮: এডওয়ার্ড হাউস থেকে

সংগ্রহীত জীবজ্ঞানের শিঃ। এছাড়া সেই

সময়ে ঘরের বাইরে ও ভেতরে

খেলার সরঞ্জাম সাজিয়ে রাখা

হয়েছে।

গ্যালারি ৯: বড় লোহার

সিন্দুকসহ অন্যান্য সিন্দুক ও

কাঠের আলমারিগুলো

নবাবদের আমলের

নির্দশন।

গ্যালারি ১০: এখানে আছে বড় বড় আলমারি, তৈজসপত্র যা নবাবের আমলের নির্দশন।

গ্যালারি ১১, ১২ ও ১৩: এই গ্যালারিগুলোতে যথাক্রমে বরেণ্য ব্যক্তিদের প্রতিকৃতি, স্যার সলিমুল্লাহ শাহরে এবং নবাবদের সমসাময়িক মনীষীদের প্রতিকৃতি দিয়ে সাজানো হয়েছে।

গ্যালারি ১৪, ১৫, ১৬, ১৭: যথাক্রমে হিন্দুস্তানি কক্ষ, প্রধান সিঁড়িঘর, লাইব্রেরি কক্ষ ও তাসখেলার ঘর।

গ্যালারি ১৮ ও ১৯: ঢাকায় পানীয় জল সরবরাহবিষয়ক নির্দশন যেসব আহসান মঞ্জিল ও এডওয়ার্ডস হাউসে পাওয়া গেছে। ঢাকা ওয়াটার ওয়ার্কের কয়েকটি দুষ্পাপ্য ছবি এখানে আছে।

গ্যালারি ২০ ও ২১: ১৯০১ সালের আগে ঢাকায় বিদ্যুৎ ব্যবস্থা ছিল না। নবাবের বিদ্যুৎ ব্যবস্থা করার তথ্য, তৈজসপত্র ও ফুলদানি সহই নবাবের আমলের।

গ্যালারি ২২: দোতলায় অবস্থিত এই গ্যালারিতে আহসান মঞ্জিলে থেকে পাওয়া অন্ত প্রদর্শিত হয়েছে। উচ্চ গম্বুজটি এই ঘরের ওপরেই অবস্থিত। গ্যালারি ২৩:

এটি ছিল নাচঘর। ১৯০৪ সালে তোলা ছবি অনুযায়ী এটি সাজানো হয়েছে।

যেতাবে যাবেন

ঢাকার মেকোনো স্থান থেকে গুলিশান এসে নর্থ সাউথ রোড ধরে কিছুদূর

গেলেই পড়াবে নয়াবাজার মোড়। এখান থেকে বাবুবাজারের দিকে যেতে

থাকবেন। বাবুবাজার ত্রিজের বামপাশে নিচ দিয়ে গেলে পড়াবে আরেকটি

মোড়। এর বামপাশে গেলেই ইসলামপুর। এখানে এসে যে কাটকে

জিজ্ঞাসা করলেই বলে দেবে আহসান মঞ্জিল যাওয়ার রাস্তা।

দর্শনার্থীদের প্রবেশের সময়সূচি

সাপ্তাহিক ছুটি বৃহস্পতিবার। এ ছাড়া অন্যান্য সরকারি

ছুটির দিনও বৃক্ষ থাকে আহসান মঞ্জিল।

গ্রাম্যকালীন সময়সূচি: (প্রিল-স্পেট্টেব্র)

(শনিবার-বুধবার) সকাল সাড়ে ১০টা

থেকে বিকাল সাড়ে ৫টা। শুক্রবার

বিকাল ৩টা থেকে সন্ধ্যা সাড়ে ৭টা।

শীতকালীন সময়সূচি: (অক্টোবর-

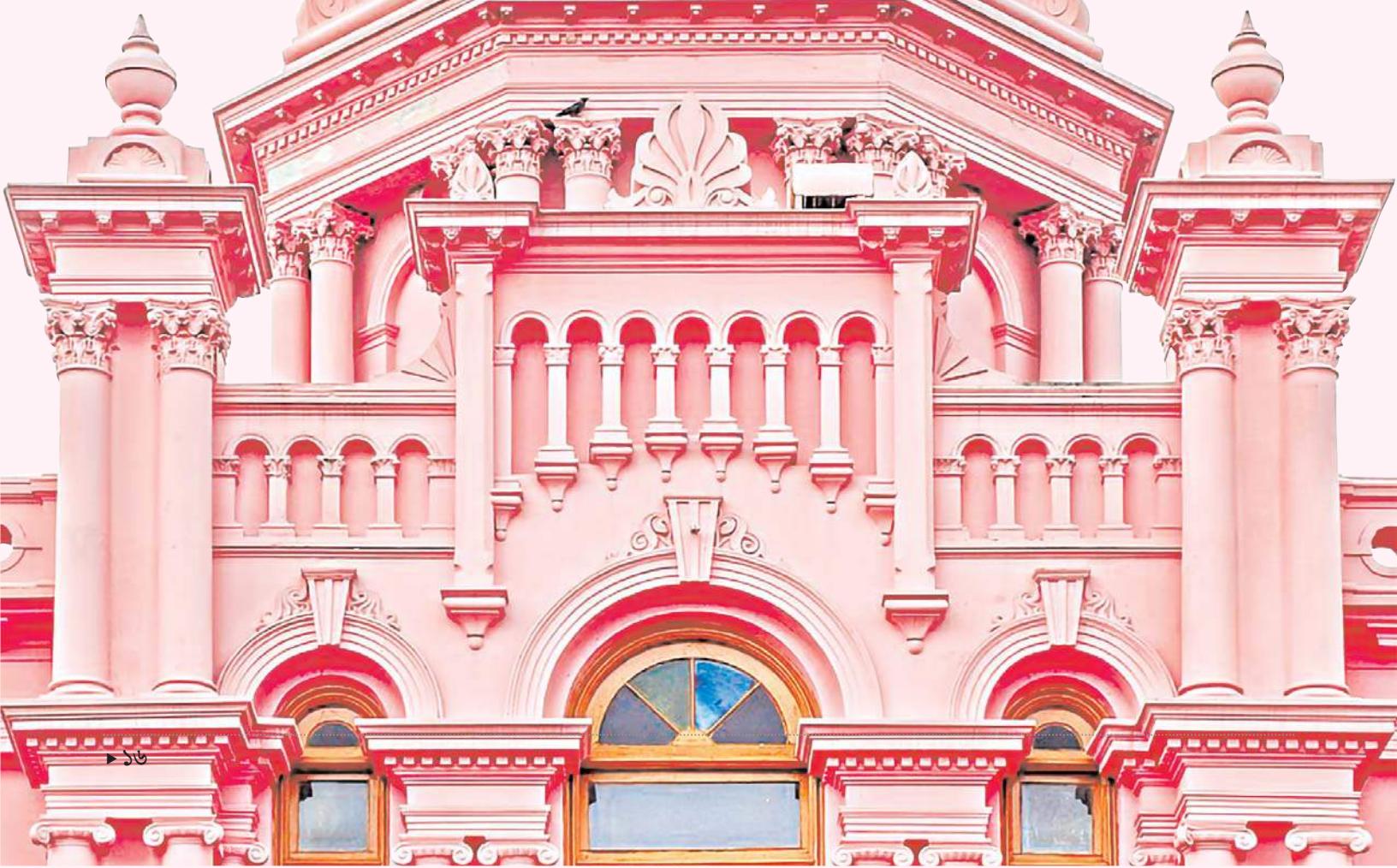
মার্চ)- (শনিবার-বুধবার) সকাল

সাড়ে ৯টা থেকে বিকাল সাড়ে

৮টা। শুক্রবার দুপুর আড়াইটা

থেকে সন্ধ্যা সাড়ে

৭টা। ◆





পুরান ঢাকার দৃষ্টিনন্দন তারা মসজিদ

ত্রিমুক্তি

■ পর্যটন বিচিত্রা ডেক্স

বাজাধানীতে প্রত্যন্ত নির্দশনের তালিকায় পুরান ঢাকার ‘তারা মসজিদ’ অন্যতম। দর্শনার্থীদের কাছে এটি বেশ পরিচিত একটি স্থান। পুরান ঢাকার মহল্লা আলে আবু সাঈদ (বর্তমান নাম আরমানিটোলা) এলাকার আবুল খয়রাত সড়কে এই মসজিদটির অবস্থান। এর আরও কিছু প্রচলিত নাম আছে। যেমন- মীর্জা গোলাম পীরের মসজিদ বা সিতারা মসজিদ।

তারা মসজিদের বয়স নিয়ে মতপার্থক্য আছে। প্রাচীন মসজিদগুলোতে সাধারণত যেমন শিলালিপি থাকে, এই মসজিদে নির্মাণকাল উল্লেখ করে তেমন কিছু পাওয়া যায়নি। ইতিহাসবিদ ও ঢাকা বিশেষজ্ঞ মুনতাসীর মামুন তার ঢাকাঃ স্মৃতি বিস্মৃতির নগরী বইয়ে মসজিদটির নির্মাণকাল অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ বলে উল্লেখ করেছেন।

বাংলাপিডিয়ায় বলা হয়েছে, নির্মাণকাল উনিশ শতকের প্রারম্ভে। এর নির্মাতা ছিলেন ধনাচ্য জমিদার মীর্জা গোলাম পীর বা মীর্জা আহমেদ জান। তার পূর্বপুরুষ মীর আবু সাঈদ তুরঙ্গ থেকে ঢাকায় এসেছিলেন ভাগ্যবেষণে। অষ্টাদশ শতকে তার পরিবারের সঙ্গে ঢাকার সন্তান জমিদার মীর আশরাফ আলীর পরিবারের বৈবাহিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ফলে মীর্জাদের ব্যবসা-বাণিজ্য এবং সামাজিক প্রভাবপ্রতিপন্থি বেশ বেড়েছিল।

তিনি যে এলাকায় থাকতেন, সেই এলাকার নামকরণও হয়েছিল তার নামানুসারে ‘আলে আবু সাঈদ’। পরে এই মহল্লাই আরমানিটোলা নামে পরিচিত হয়ে ওঠে। ফলে মীর্জাদের ব্যবসা-বাণিজ্য এবং সামাজিক প্রভাবপ্রতিপন্থি বেশ বেড়েছিল। তিনি যে এলাকায় থাকতেন, সেই এলাকার নামকরণও হয়েছিল তার নামানুসারে ‘আলে আবু সাঈদ’। পরে এই মহল্লাই আরমানিটোলা নামে পরিচিত হয়ে ওঠে।

মীর্জা আবু সাঈদের নাতি মীর্জা গোলাম পীর আরমানিটোলায় এই মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন।

তিনি এটি ওয়াক্ফ করে গিয়েছিলেন। তখন লোকমুখে এর নাম ছিল ‘মীর্জা সাহেবের মসজিদ’। মীর্জা গোলাম পীর ইঙ্গেকাল করেন ১৮৬০ সালে।

তারা মসজিদের নির্মাণকাল উনিশ শতকের প্রারম্ভে। এর নির্মাতা ছিলেন ধনাচ্য জমিদার মীর্জা গোলাম পীর বা মীর্জা আহমেদ জান। তার পূর্বপুরুষ মীর আবু সাঈদ তুরঙ্গ থেকে ঢাকায় এসেছিলেন ভাগ্যবেষণে। অষ্টাদশ শতকে তার পরিবারের সঙ্গে ঢাকার সন্তান জমিদার মীর আশরাফ আলীর পরিবারের বৈবাহিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ফলে মীর্জাদের ব্যবসা-বাণিজ্য এবং সামাজিক প্রভাবপ্রতিপন্থি বেশ বেড়েছিল। তিনি যে এলাকায় থাকতেন, সেই এলাকার নামকরণও হয়েছিল তার নামানুসারে ‘আলে আবু সাঈদ’। পরে এই মহল্লাই আরমানিটোলা নামে পরিচিত হয়ে ওঠে।

তারা মসজিদের আগের রূপটি এখন আর নেই। প্রথম দিকে এমন অলংকৃতও ছিল না। মোগল স্থাপত্যরীতির তিন গম্বুজবিশিষ্ট এই মসজিদ ছিল বেশ সাদামাটা ধরনের।

তিন গম্বুজ তারা মসজিদটি ছোট আকারের ছিল। দৈর্ঘ্য ৩০ ফুট ও প্রস্থ ১২ ফুট। সম্প্রসারিত করে ছাদে তিন গম্বুজের সঙ্গে আরও দুটি গম্বুজ নির্মাণ

করা হয়। এখন পরিবর্ধিত মসজিদটি দৈর্ঘ্যে ৭০ ফুট ও প্রস্থে ২৬ ফুট।

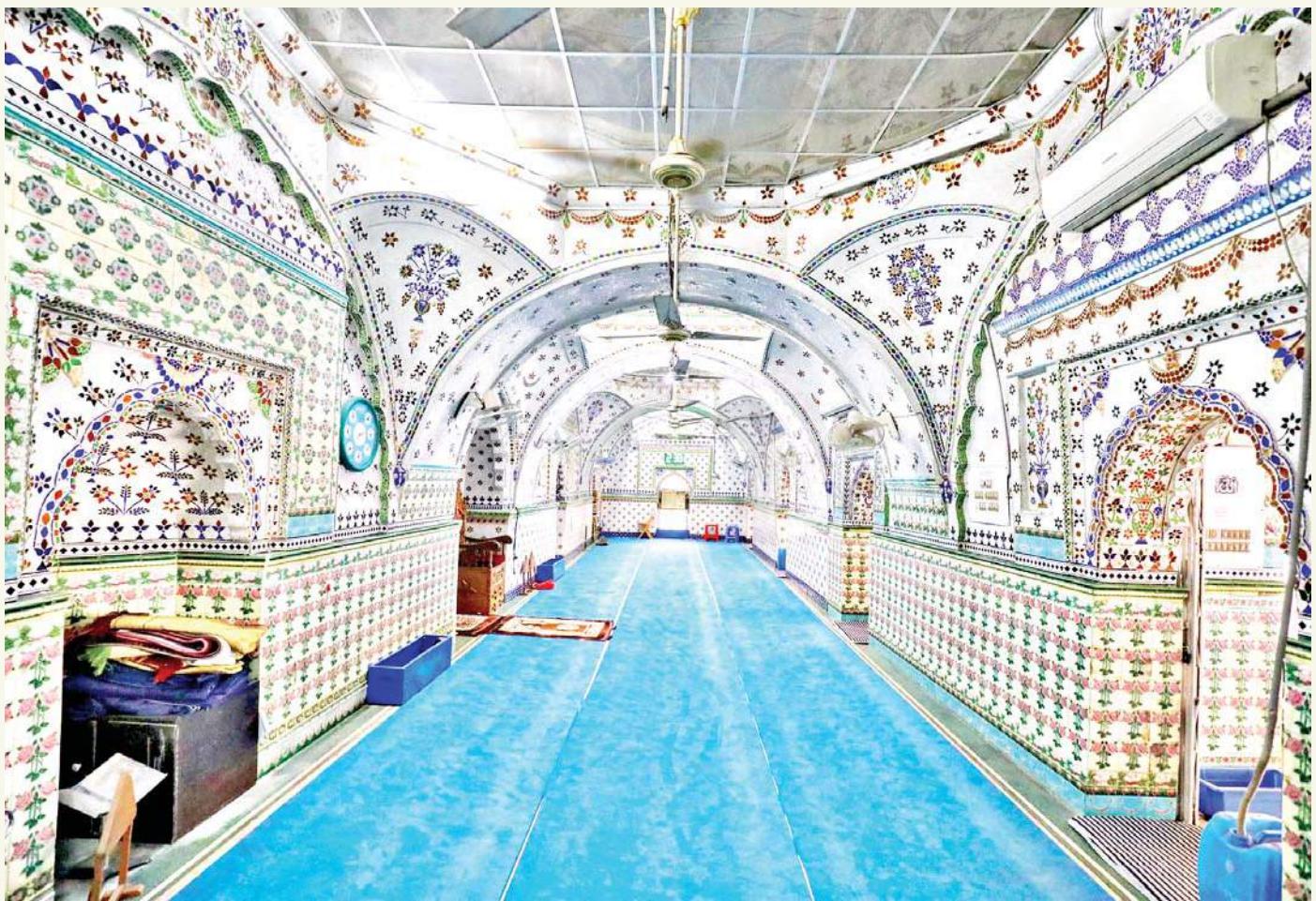
১৯২৬ সালে মসজিদটি প্রথমবারের মতো সংস্কার করেন আরমানিটোলার ধনাচ্য ব্যবসায়ী আলী জান ব্যাগারী। তিনি বিপুল অর্থ খরচ করে জাপানসহ বিভিন্ন দেশ থেকে উন্নত মানের টাইলস, মার্বেলসহ মূল্যবান নির্মাণসমগ্রী এনে মীর্জা সাহেবের মসজিদটির সংস্কার করেন। এ সময় গম্বুজ ও ভেতরবাইরের দেয়াল ফুল, লতাপাতা ও নান্দনিক নকশায় অলংকৃত করা হয়। মূল ভবনের সঙ্গে সংযুক্ত হয় বারান্দা। গম্বুজগুলোতে সাদা ও নীল রঙের মার্বেল ও টাইলসে অসংখ্য তারা ফুটিয়ে তোলা হয়। সেই থেকে মসজিদটির নাম পাণ্ডে যায়। লোকে বলতে থাকেন ‘তারা মসজিদ’।

সাদা মার্বেলের গম্বুজের ওপর নীলরঙে তারায় খচিত এই স্থাপনা মুন্ডকর। মসজিদের সামনে এলে দর্শনার্থীদের প্রথমেই চোখে পড়ে বিশাল আকৃতির কোয়ারাবেষ্টি একটি তারা।

মসজিদের জুলায় প্রবেশের জন্য পাঁচটি খিলানবিশিষ্ট পথ সৃষ্টি করা হয়েছে। এগুলো বহু খাঁজবিশিষ্ট এবং চারটি অষ্টুভাকৃতির সৃষ্টি থেকে উন্নিত। মসজিদের অভ্যন্তর ও বাইরের পুরোটাই মোজাইক নকশা করা। এর গায়ে চিনামাটির বাসন, পেয়ালা ইত্যাদির ছোট ভগ্নাংশ ও কাচের টুকরো ব্যবহৃত হয়েছে। এ পদ্ধতিকে ‘চিনি টিকির’ বা চিনি দানার কাজ বলা হয়। মসজিদের গাত্রনকশায় রয়েছে ফুলদানি, ফুলের ঝাড়, গোলাপ ফুল, এক বৃক্তে একটি ফুল, চাঁদ, তারা, নক্ষত্র ও আরবি ক্যালিগ্রাফিক লিপি।

এখানে মসজিদের তো নামাজ আদায় করতে আসেনই; বহু বিদেশি পর্যটক, রাষ্ট্রদ্বন্দ্ব, গণ্যমান্য অতিথিরা ও ঢাকার প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী এই মসজিদ দেখতে আসেন দর্শনীয় স্থান হিসেবে।

তারা মসজিদের ভেতরে চারটি কাতার এবং



বারান্দায় আছে তিনটি কাতার। এতে প্রায় ২৮৫ জন মুসলিম এখানে জামাতে দাঁড়াতে পারেন। দ্বিতীয় বার সংক্ষারের সময় পুরোনো বারান্দার সামনেও অনেকটা জায়গা মার্বেল পাথরের ফলক পেতে নামাজের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই অংশের ওপর এখন ত্রিপলের ছাউনি টাঙ্গানো হয়েছে। এ অংশে সামনের মঠ মিলিয়ে প্রায় দেড় হাজার মুসলিম এখানে নামাজ আদায় করতে পারেন। তা ছাড়া দুই দৈরে জামাতও হয় এখানে।

প্রায় ৩০ বছর থেকে স্থানীয় বাসিন্দা মাওলানা তোফাজাল হোসেন মুসজিদিন হিসেবে কাজ করছেন তারা মসজিদে। এখন ইমামের দায়িত্বে আছেন মাওলানা শফিকুল ইসলাম।

১৯৮৭ সাল থেকেই তারা মসজিদ সরকারি ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হচ্ছে। আগে ঢাকার বিভাগীয় কমিশনার মসজিদ পরিচালনা কমিটির প্রধান ছিলেন।

গত বছর থেকে এ দায়িত্ব ওয়াকফ প্রশাসকের ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে। ওয়াকফ প্রশাসনের ব্যবস্থাপনায় মসজিদটি পরিচালিত হচ্ছে। এখানে একটি হেফজখানা ও মক্কুল এবং লিলাহ বোর্ডিং রয়েছে। সরকারি অনুদান ও এলাকাবাসীর দানে এগলোর কার্যক্রম পরিচালিত হয়। রমজান মাসে প্রতিদিন প্রায় ১০০ মানুষের জন্য করা হয় ইফতারের আয়াজন।

যেভাবে যাবেন
পুরান ঢাকার আরমানিটোলার আবুল খয়রাত
সড়কের ৮ নম্বর হোস্টিং ভবনটিই হলো বিখ্যাত
'তারা মসজিদ'। ঢাকার থেকেনো জায়গা থেকে খুব



সহজেই তারা মসজিতে আসা যায়। চানখারপুর, গুলিস্থান কিংবা বাবুবাজার সেতুতে রিকশাচালককে আরমানিটোলা স্কুল বা তারা মসজিদ বললেই চলবে।

গুলিস্থান থেকে রওনা দিলে সিদ্ধিক বাজার সড়ক

হয়ে বৎশাল দিয়ে সোজা পশ্চিমে এগিয়ে গেলে পড়বে মাহত্ত্বুলী চৌরাস্তার মোড়। হাতের বাঁ অর্থাৎ দক্ষিণে মোড় নিয়ে কিছু দূর গেলেই ডানে আবুল খয়রাত রোড। সামনে আরমানিটোলা উচ্চবিদ্যালয়, তারপরই হলো তারা মসজিদ। ◆



লাহোরে মোগলকীর্তি দর্শনে

প্রতিক্রিয়া

■ প্রকৌশলী জেবি বড়ুয়া

বহুদিন আগের কথা । ১৯৬৫ সালের জুনে পূর্ব পাকিস্তান প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের চতুর্থ বর্ষের আমরা ২০ জন ছাত্র ও দলনেতা একজন শিক্ষক শিক্ষাসফরে পশ্চিম পাকিস্তানে যাই । পশ্চিম পাকিস্তান সরকারের সংশ্লিষ্ট মহল, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, লাহোর ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয় ও পেশোয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজকে আমাদের ট্যুর প্রোগ্রাম জানিয়ে দেয়া হয় । যথাসময়ে ২১ জনের ঢাকা-লাহোর ও করাচি-ঢাকা পিটাই এর (পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনেল এয়ারলাইনস) টিকিট কাটা হলো ।

৯ জুন দুপুর ১২টায় বিমান লাহোরের উদ্দেশে ঢাকা ছাড়ে । স্থানীয় সময় বেলা আড়াইটায় আমরা লাহোর বিমানবন্দরে অবতরণ করি । আমার কেন যেন ধারণা ছিল লাহোরে সবুজের নিশানা মিলবে না । বিমানবন্দর থেকে বাসে করে শহরের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে আমার সে ধারণা ভুল প্রমাণিত হলো । বাংলা দেশের যে কোনো শহরের চেয়ে অনেক বেশি সবুজ এ শহর । রাজপথের দুপাশে সুদৃশ্য সবুজ বৃক্ষসারির শোভা বড়ই দ্রষ্টিন্দন ।

লাহোর ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়ের এক হলে (ওমর হল) আমাদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল । ধূলায় ধূসরিত এক কমনরম আমাদের থাকার জন্য দেয়া হয় । বাথরুমগুলি অপরিচ্ছন্ন, তেমনি আবার পানির স্বল্পতা । লাহোরে নেমে বিমানবন্দরে তেমন গরম অনুভব করিনি । কিন্তু ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে এসে দেখি আসহনীয় গরম । আমাদের সৌভাগ্য যে গরমে রাতে বাইরে শোয়ার জন্য প্রত্যেককে একটা করে ক্যাম্পাসটা দেয়া হয়েছিল । কিছুক্ষণ বিশ্বামের পর আমরা এতিহাসিক ‘শালিমার বাগ’ দেখতে বের হই । হল থেকে বের হয়ে দেখি, হলের গেটের পাশে এক হকার পাকা সতেজ মাল্টা বিক্রি করছে । পূর্ব পাকিস্তানে মাঝে মধ্যে কোন সময় মাল্টা পাওয়া গেলেও এরকম মানের মাল্টা কলনাও করা যায় না । আমি বেশ কিছু মাল্টা কিনি । আমার বন্ধুরা এসে ছড়োহাড়ি করে আমার হাত থেকে সব কেড়ে নেয় । দেশে যে একটা পুরোনো প্রবাদ আছে- যে কুল গাছে উঠে কুল পাড়ে তার কপালে কুল জোটে না, অন্যরাই সব খেয়ে

শালিমার বাগ দূরে মনে করে আমরা বাসস্ট্যান্ডে গিয়ে বাসের জন্য অপেক্ষা করতে থাকি । ওখানে একজনকে জিজ্ঞাসা করতে সে বলল- ‘ইয়ে ত নাজদিগ হ্যায়, আবি এক ফার্লং কি দো ফার্লং হোগা, পায়দল মে চলা যাইয়ে’ । তার কথা শুনে আমরা পায়দলেই রওনা হলাম । কিন্তু দুই ফার্লংয়ের বেশি হাঁটার পরও শালিমার বাগের কোনো পাত্তা নেই । তখন আরেক পথচারীকে জিজ্ঞাসা করলে সেও বলল- ‘আবি এক ফার্লং কি দো ফার্লং হোগা’ । আরও অনেক দূর যাবার পর আরেকজনকে জিজ্ঞাসা করলে তার কাছ থেকেও একই উত্তর পাওয়া গেল ।



ফেলে, সে খালি হাতে ফিরে। আমরাও হলো সে অবস্থা। কি আর করা যাবে, রাগ দেখালে শাস্তির বহর আরও বেড়ে যাবে। হাসিমুখে বন্ধুদের এ অত্যাচার সহ্য করতে হয়।

শালিমার বাগ দূরে মনে করে আমরা বাসস্ট্যান্ডে গিয়ে বাসের জন্য অপেক্ষা করতে থাকি। ওখানে একজনকে জিজ্ঞাসা করতে সে বলল- ‘ইয়ে ত নাজদিগ হ্যায়, আবি এক ফার্লাং কি দো ফার্লাং হোগা, পায়দল মে চলা যাইয়ো।’ তার কথা শুনে আমরা পায়দলেই রওনা হলাম। কিন্তু দুই ফার্লাংয়ের বেশি হাঁটার পরও শালিমার বাগের কোনো পাতা নেই। তখন আরেক পথচারীকে জিজ্ঞাসা করলে সেও বলল- ‘আবি এক ফার্লাং কি দো ফার্লাং হোগা।’ আরও অনেক দূর যাবার পর আরেকজনকে জিজ্ঞাসা করলে তার কাছ থেকেও একই উত্তর পাওয়া গেল। কি আশ্চর্য! মোহাম্মদ বিন তোঘলার বাংলাদেশে বিদ্রোহ দমন করে রাজধানী দিল্লিতে ফিরছিলেন। তখন নিজামউদ্দিন আউলিয়া বলেছিলেন- ‘দিল্লি দুরত্ব’। আমি নিশ্চিত তিনি লাহোরের বাসিন্দা ছিলেন না। তা না হলে তিনি বলতেন- বাংলা থেকে দিল্লি ‘এক ফার্লাং কি দো ফার্লাং হোগা।’ যাহোক প্রায় চার মাইল হাঁটার পর শেষ পর্যন্ত শালিমার বাগের দেখা মিলল।

ভারতে মোগল সামাজের প্রতিষ্ঠাতা সম্রাট বাবরের থপোত্তু শাহজাদা সেলিম (পরে সম্রাট জাহাঙ্গীর) দিল্লির সিংহাসনে আরোহণের অব্যবহিত পরে কেমন করে শেরে আফগানকে হত্যা করে, তার সুন্দরী স্ত্রী মেহেরেউনিসার পাণি গ্রহণ করে তাকে সমাজীর মর্যাদা দিয়েছিলেন, তা স্কুলপাঠ্য ইতিহাসে আছে। পারস্য সুন্দরী নুরজাহানের পিতা নিতান্ত ভাগ্য্যবেষ্যমে ভারতে এসেছিলেন একমাত্র শিশুকন্যাকে সঙ্গে নিয়ে। তখন কি তিনি কঞ্চনা করতে পেরেছিলেন- তার এই শিশুকন্যাকে একদিন ভারতের সমাজী হবেন এবং তারই অঙ্গুলি নির্দেশে মোগল সম্রাট ও মোগল সম্রাট পরিচালিত হবে।

তখন সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বের মধ্যাহ্নকাল। পাঞ্জাবের বিদ্রোহীরা বেশ তৎপর হয়ে উঠেছিল, মোগল সেন্যদের সাথে ছোটখাট সংঘর্ষ সব সময় লেগে বইলো। সম্রাট জাহাঙ্গীর ঠিক করলেন- তিনি নিজে কিছুদিন লাহোরে অবস্থান করে সমৃলে বিদ্রোহীদের দমন করবেন। নারীসঙ্গ সুখ বিলাসী সম্রাট জাহাঙ্গীর যেখানেই যান সেখানেই থাকবে তার অন্তঃপুরিকার দল- সেটা অন্তঃপুর না হয়ে যুদ্ধক্ষেত্র হলেও।

অন্তঃপুরিকারের নিয়ে আমাদের ফুর্তি করার মত লাহোরে তেমন কোনো ব্যবস্থা ছিল না। তাই নুরজাহানের নির্দেশে শালিমার বাগ নির্মিত হয়। গ্রীষ্মের এক তঙ্গ অপরাহ্ন বেলায় সুন্দর বাংলা থেকে আগত আমরা ২১ জন যুবক দাঁড়ালাম ১৬৭৬ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত জগত আলো নুরজাহানের অমর কীর্তি বিখ্যাত শালিমার বাগের সামনে। আমাদের সবার মনে অন্তুত অনুভূতি। মনে মনে বললাম- ‘হে অতীত তুমি কথা কও।’

পরক্ষণে মনে হলো- ইতিহাসের এক অনধিত অধ্যায় আমার চোখের সামনে খুলে গেল। এই শালিমার বাগের শান বাঁধানো চতুরে, ফোয়ারার ধারে, গোলাপকুঁশের পাশে সম্রাট জাহাঙ্গীরের কেটেছে কৃত

বিন্দু রজনী, সুরা পানে আর বাইজি নাচে। এই শান বাঁধানো পাথর আর ফোয়ারা তার নিরব সাক্ষী। পাথরগুলিতে কান পাতলে এখনো শোনা যাবে বিস্মৃত অতীতের নানা আজানা কাহিনি, ইতিহাসে নেই এমন কত কথা।

পাক-ভারতের মোগল স্থাপত্য পৃথিবীর স্থাপত্যের ইতিহাসে

এক বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। এই শালিমার বাগও

মোগল স্থাপত্যের এক অপূর্ব নির্দশন। কৃত্রিম ফোয়ারাগুলির

গঠনপ্রণালী সত্যি বিস্ময়ের উদ্দেক করে।

সন্দুশ শতাব্দীর প্রকৌশলীদের

Hydraulics এর জ্ঞান

ও পারদর্শিতা

দেখে

আশ্চর্য না হয়ে পারিনি।

পাঞ্জাব বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয় সব শেষে। বৃটিশরা লাহোর দখল

করার পর শালিমার বাগের একবার সংস্কার সাধন করা হয়। সম্রাজ্ঞী

নুরজাহান আজ নেই, মোগল সাম্রাজ্যের হয়েছে পালন, বৃটিশ

উপনিবেশিকতার হয়েছে অবসান। কিন্তু শালিমার বাগ আজও স্থির

নিশ্চল হয়ে বিবাজ করছে লাহোরের প্রাসাদসমানায়। হয়তো শালিমার

বাগের সেই পুরোনো বৈতান নেই, নেই সেই ‘পারসিয়ান গোলাম’

কিংবা ‘বাংলাদেশের লেটার্স’। তব আজও যা আছে তা অতুলনীয়।

আজও প্রত্যহ সন্ধিয়া আসে বিদেশী পর্টকরা, আসে লাহোরের প্রণয়া-

যুগলেরা, অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারীর দল, আসে স্কুল কলেজের

নবীন তরুণের দল, ক্লিক ক্লিক করে ক্যামেরার স্পুল খালি করে ফিরে

যায়।

পরিত্রক মন ও অনাবিল প্রশান্তি নিয়ে শালিমার বাগ থেকে বের হই।

মনে হলো যেন ইতিহাসের এক অশরীরী ছায়া অনেক দূর পর্যন্ত

এগিয়ে দিয়ে বিদ্যমানাল।

১১ জুন সকাল ৮টা, প্রাতরাশ সারার জন্য আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের

ক্যাফেটেরিয়াতে আসি। এখানকার ক্যাফেটেরিয়ার আসবাবপত্র ও

অন্যান্য ব্যবস্থাদি দেখে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাফেটেরিয়ার

জংধরা লোহার চেয়ার ও মুসি মিএরা ভাঙ্গ আলমারির ছবি

চোখের সামনে ভেসে উঠল। দেখলাম পূর্ব ও পশ্চিমের পার্থক্য।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বাসে ঢেড়ে আমরা প্রথমে যাই ইতেকাক

ফাউন্ড্রিতে। এরপর আমরা ‘রোড রিসার্চ ইনসিটিউট’ ও ‘ইরিগেশন

রিসার্চ ল্যাবরেটরি’ পরিদর্শন করি। এসবের বিবরণ এখানে আর

দিলাম না।

বেলা সাড়ে ১১টায় আমরা চলেছি বিলাম নদীর ওপর দিয়ে জগত

আলো নুরজাহানের সমাধির পানে। লাহোর শহরের অন্তি দূরে

বিলাম নদীর তীরে বাউলের মাঝে মোগল সমাজী নুরজাহানের

সমাধি। নসিব চিরদিন নুরজাহানের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছে।

‘মরভূমির শুক বুকে গরিব ঘরে জন্মে তোমারই অঙ্গুল হেলনে

মোগল সমাজ পরিচালিত হয়েছিল। আবার নসিব তোমাকে টেনে

এনেছে এখানে। তোমার কবরের ওপর দাঁড়িয়ে আছে মোগলদের

সবচেয়ে দরিদ্রতম স্থূতিসৌধ। গরিব বাপের গরিব মেয়ের এই

তো উপযুক্ত সমাধি।’ দেন্যদশার নির্মতায় গড়ে উঠেছিল যে

জীবন, সায়াহে আবার সে অবস্থায় ফিরে গিয়েছিল। তাই আজ

-

‘লাহোরের শহরতলির কঁটাবনের আবডালে,

লঙ্গ তোমার কপোর লহর জঙ্গে আর জঙ্গালে।

জীর্ণ তোমার সমাধি আজ, মিনার বাহার যায় বারি,

আজকে তুমি নিরাভরন চিরদিনের সুন্দরী।’ (সত্যেন্দ্রনাথ

দত্ত)

আমরা সবাই গিয়ে দাঁড়ালাম মোগল যুগের তিলোনাম দীনদৰিদ্র সমাধির সামনে। কবির ভাষ্য বললাম-

‘বাংলা থেকে দেখতে এলাম মরভূমির গোলাপ ফুল,

ইরান দেশের শুকুলা কই সে তোমার কপ আতল?

পায়াগ করব বোরখা খোল দেখব তোমায় সুন্দরী,

দাঁড়াও শোভার বৈজয়ন্তি ভুবন বিজয় কপ ধৰি।’ (স. দ.)

নুরজাহানের কবরের শিয়ারে ফারসি ভাষায় লেখা

আছে এক অশ্রুভরা করুণ শ্লোক-

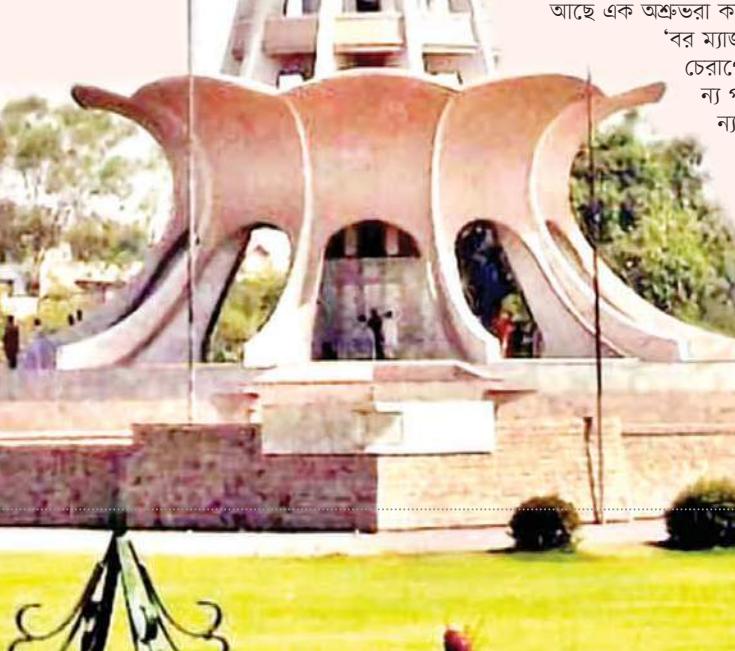
‘বর ম্যাজারে গরিবা ন্য

চেরাগে ন্য গুলে

ন্য পরে পরমানা সুজুদ

ন্য স্যাতায়ে বুলবুলে।’

‘সত্যি তোমার





কবরে আজ দীপ জ্বলে না নুরজাহান,
সত্যি কাঁটার জঙ্গলে পুষ্পলতার লুঞ্ছ প্রাণ।’
প্রিয়তমা পত্নীর সমাধির অন্তিম দূরে সমাট
জাহাঙ্গীরের সমাধি, যার নাম ‘জাহাঙ্গীর ঠোঁষ’।
মৃতুর পূর্বে সমাট জাহাঙ্গীর কোনো নির্দেশ
দিয়েছিলেন কিনা জানি না। সমাট জাহাঙ্গীর হয়তো
চেয়েছিলেন, মৃতুর পরও প্রিয়তমার সান্নিধ্য পেতে,
হয়তো চেয়েছিলেন, প্রিয়তমার দীর্ঘশ্বাস তার
সমাধির ওপর গিয়ে পোঁছাক।

জাহাঙ্গীর ঠোঁষে এসে দেখি একদল মেয়ে ফোয়ারার
থারে বসে একে অন্যকে পানি ছিটাচ্ছে। ঠোঁষ
এলাকার সমুখ প্রাসাদ তাদের কলকাকলিতে মুখের
লাহোরের কোনো এক মহিলা কলেজের ছাত্রীরা
এসেছে বনভোজনে। তবে এটাকে বনভোজন না
বলে বাগানভোজন বলাই হবে ঠিক। মোগলদের
অন্যান্য সৌধের থেকে এটা পৃথক কিছু নয়। মূল
সমাধির গঠন অনেকটা আগ্রার সমাট আকবরের
সমাধির মতো, চারদিকের বাগান, ফোয়ারা ও
প্রবেশপথ তাজমহলের অনুরূপ।

মধ্যাহ্নভোজনটা মধ্যহের অনেক পরে সমাপন করে
আমরা বাদশাহি মসজিদে যাচ্ছিলাম। পথে সুন্দর
একটি মিনার দেখে ওটা ভালো করে দেখার জন্য
নেমে পড়ি। এটি হলো- ১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ
পাকিস্তান স্থিতির জন্য যে ঐতিহাসিক ‘লাহোর প্রস্তাব’
গৃহীত হয়, তারই স্মৃতিসৌধ ১৯৪৪ ফুট উচ্চ সুরম্য
মিনার ‘মিনার-ই-পাকিস্তান’।

এরপর আমরা আসি বাদশাহি মসজিদে। পৃথিবীর
সর্ববৃহৎ অতি সুন্দর এই মুসলিম উপসনাগারটি
নির্মাণ করেন ভাতুরঙ্গে কল্পিত, পিতৃহস্ত সমাট
আওরঙ্গজেব। প্রতি সন্ধ্যায় এর সুউচ্চ মিনার থেকে
ধ্বনিত হয় আজানের সুর, প্রতাহ শত শত ধৰ্মপ্রাণ
লোক এ এবাদতখানায় আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে।
হয়তো কেউ কেউ শুন্ধা জানায় এর নির্মাতা পীর
আলমগীরকে। বিদেশ পর্যটকরা আসে মধ্যযুগের
বিরাট কীর্তিকে সচক্ষে দেখতে, আসে স্থাপত্যকলার
পূজারিব। দেখে তাদের চোখ জুড়ায়, তৃপ্ত হয় মন।
গঠন পরিপন্থে, সৌন্দর্যে ও আকরণে এটি দিল্লির
জুমা মসজিদকে হার মানায়। মসজিদের ভেতর-
বাহির খব পরিষ্কার পরিষ্কার, বাকবাকে তকতকে।
সামনে বিরাট তোরণ, চারদিকে উচ্চ প্রাচীর। চার
কোণে চারটি সুউচ্চ মিনার, মাঝখানে তিনটি বড়
বড় গম্বুজ নিয়ে মূল মসজিদ। কোণার উচ্চ



মিনারগুলি থেকে লাহোর শহরের তিন চতৃর্থাংশ
দৃশ্যমান হয়। আমরাও একটি মিনারে উঠে সে দৃশ্য
দেখি।
বাদশাহি মসজিদের অঞ্চল দূরে আকাশে মাথা তুলে
দাঁড়িয়ে আছে শিখদের লাহোর বিজয়ের চিহ্ন ধ্বারণ
করে প্রেতপাথরের নির্মিত একটি অপূর্ব সুন্দর
গুরদোয়ারা। এককালে নাকি এর চূড়াটি স্বর্ণ দিয়ে
মোড়া ছিল রেঙ্গুনের সোয়েডাগন পেগোডার মতো।
বাদশাহি মসজিদ থেকে আমরা যাই লাহোর
কেল্লায়। কেল্লাটি সমাট আকবর নির্মিত। কেল্লাটি
দিল্লির লালকেল্লা বা আগ্রাকেল্লের চেয়ে অনেক
�োট। গঠন শৈলী ও সৌন্দর্যেও অনেক নীচু
মানের। যারা দিল্লির লালকেল্লা বা আগ্রাকেল্লে
দেখেনি, তাদের কাছে স্বাভাবিকভাবে এটাই খুব
দশনীয়। আমরা ঘুরে ঘুরে দেখলাম সমাটের দরবার,
বেগমদের বিভিন্ন মহল, আমাত্য ও সেনাপতিদের

বিভিন্ন ওয়ার্ড। এক জায়গায় আছে একটি সুড়ঙ্গের
মতো পথ, সামনে লোহার দরজা। এটা রাজবন্দিদের
সেল। নেই আলো বাতাস প্রবেশের কোনো পথ।
লৌহ কপাটের সামনে দাঁড়িয়ে মনে হলো- সেলের
অভ্যন্তর থেকে কত অভিশপ্ত আত্মার গোঙানি ভেসে
আসছে। হয়তো লালকেল্লার এমনি একটা সেলে
বন্দি করে রাখা হয়েছিল সমাট শাহজাহান ও তার
অতি আদরের কন্যা জাহানারাকে। এ রকম কোনো
সুড়ঙ্গ দিয়ে গড়িয়ে পাঠিয়েছিল, প্রিয়তম পুত্রের
খণ্ডিত মস্তক তার পিতার ক্ষেত্রে। চোখের সামনে
ইতিহাসের পাতা খলে গেল, পিছিয়ে গেলাম
পাঁচ/ছয়শ বছর আগের এক অপরাহ্ন বেলায়।
ইতিহাসের অনধিত অধ্যায় করুণ মিনতি জানাচ্ছে,
আরও করুণ আরও হৃদয়বিদ্যারক কাহিনি শোনার
জন্য।

লেখক: গবেষক ও পরিব্রাজক (অব. সরকারি কর্মকর্তা) ◆

জামালপুর জেলার প্রত্রপর্যটন সম্ভাবনা

ত্রিমুক্তি

■ ড. মো. আতাউর রহমান

‘দেশের অর্থ দেশেই রাখুন, গ্রামীণ প্রত্রপর্যটন বিকাশে এগিয়ে আসুন’। সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা সোনার এই বাংলাদেশের আমাদের বাঙালির ইতিহাস ঐতিহ্য ও প্রত্রনির্দশন সারাদেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে জালের মতো, অথচ এর প্রচার বড়ই অভাব লক্ষ্যণীয়। স্বাধীনতার পোকাশ বছর বা সুবর্ণজয়ন্তিকালে বাংলাদেশ এখন স্বল্পন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল তথ্য মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হয়েছে। এ ধারা অব্যহত থাকলে ২০৪১ সালে বাংলাদেশে একটি উন্নত দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে। এখন পর্যন্ত সারা দেশে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় প্রত্রতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক ৫২৫টি প্রত্রতাত্ত্বিক নির্দশন সংরক্ষিত হয়ে থাকলেও জামালপুর জেলায় কোনো একটি ও প্রত্রতাত্ত্বিক নির্দশন সংরক্ষিত পুরাকীর্তি তালিকাভুক্ত হ্যানি, যা দুঃখজনকও বটে। আর সেসব অভাব যোচানের উদ্দেশ্যে দেশ-বিদেশ পর্যটকদের সামনে উপস্থাপন করার লক্ষ্যেই আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াস। এটি প্রকাশিত হলে একদিকে যেমন প্রত্রপর্যটনের বিকাশ ঘটবে অপরদিকে সরকারের রাজস্ব আয়ও বৃদ্ধি পাবে। এছাড়া স্থানীয় শিক্ষিত বেকার জনগোষ্ঠীর কর্মসংঘানের সুযোগ সৃষ্টি হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

তোগোলিকভাবে জামালপুর জেলা বাংলাদেশের মধ্যাংশের অঞ্চল। ময়মনসিংহ বিভাগের একটি প্রশাসনিক অঞ্চল। পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত। বিশেষ করে কৃষি পণ্যের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য কেন্দ্র। এ জেলায় গারো, বংশী, হাজঁ, ইদি, কুরমি ও মাল প্রভৃতি আদিবাসী জনগোষ্ঠীর বসবাস রয়েছে।

জামালপুর জেলার ঐতিহাসিক কয়েকটি প্রত্রপর্যটন স্থান হলো—
হযরত শাহ জামালের (রহ.) মাজার
জামালপুর জেলা সদরের ব্রহ্মপুত্র নদী তীরে চাপাতলি ঘাটের কাছে বিখ্যাত সাধক পুরুষ শাহ



জামালের (রহ.) মাজার শরীফ অবস্থিত। সমাধিক্ষেত্র ছাড়াও পুরোনো একটি সুন্দর মসজিদ আছে। এখানে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করা হয়। স্থানীয় জনশ্রুতিতে জানা যায়, ১৫৮৬ খ্রিষ্টাব্দে সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে হযরত শাহ জামাল (রহ.) ধর্ম প্রচারের জন্য অতি অঞ্চলে আগমন করেন। এই সুফি দরবেশ সুন্দর মধ্যপ্রাচ্য ইয়েমেন থেকে এসে খরস্তোত্ত ব্রহ্মপুত্র নদীতীরে আস্থান স্থাপন করেন। হযরত শাহ জামাল একজন পীর কামেল লোক ছিলেন। তার আধ্যাতিক জ্ঞান ও অলৌকিক ক্ষমতার কথা দিল্লির মুঘল দরবার পর্যন্ত পৌঁছে যায়। ওই সময় বাদশা আকবর হযরত শাহ জামালের খানকার ব্যায়াম বহন করতে ইচ্ছা পোষণ করে এবং সিংহজনির অধীনে কয়েকটি পরগনা পীরপাল দানের সনদ পাঠায়। এই লোভনীয় প্রস্তাৱ সুফি দরবেশ হযরত শাহ জামাল অবজ্ঞাভৰে প্রত্যাখ্যান করেন। পরবর্তীতে তাঁর নামেই অত্রাঞ্চলের নামকরণ জামালপুর হয়। এখানে প্রতিবছর ভক্তবন্দ সমবেত হয়ে ওরশ মাহফিল পালন করেন। বর্তমানে আধুনিক নির্মাণ শৈলীতে আধুনিকীকরণ করা হয়েছে। এখানে প্রতিদিন অসংখ্য ভক্ত জিয়ারত ও বিভিন্ন উদ্দেশ্যে মাননীয় শিখি দিতে আসে।

প্রত্রপর্যটিক তথ্য ভ্রমণপিপাসুদের জন্য খুবই আকর্ষণীয় স্থান এই হযরত শাহ জামালের মাজারটি। এটি আরও ইতিহাস সমৃদ্ধ করে সংরক্ষণ ও সুন্দর করে উপস্থাপন করতে পারলে একদিকে দেশের সর্ববৃহৎ মুসলিম সম্প্রদায়ের কাছে একটি আকর্ষণীয় প্রত্রতীর্থ হবে এবং সেই সাথে স্থানীয় শিক্ষিত বেকার জনগোষ্ঠীর কর্মসংঘান সৃষ্টি হবে।

চিকাজানী একগম্বুজ জামে মসজিদ
জেলার দেওয়ানগঞ্জ উপজেলার চিকাজানী ইউনিয়নের ঐতিহাসিক চিকাজানী একগম্বুজ জামে মসজিদটি গায়েবে মসজিদ নামে পরিচিত। আগে এখনে অঙ্কুর ভুতুড়ে ছিল। এখন এটি উজ্জ্বল আলোকিত। এলাকার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ইশতিয়াক হোসেন দিদারের নেতৃত্বে এলাকাবাসী এটিকে উজ্জ্বল রূপ দিয়েছেন বলে জানা যায়। এলাকাটি খুব সুন্দর। মসজিদটি নির্মাণের সম তারিখ না পাওয়া গেলেও এর নির্মাণক্ষেত্রে ও অবকাঠামোগত বিচার বিশ্লেষণে সুলতানি আমলের মুসলিম শিল্পকলার অনন্য নির্দশন হিসেবে সহজেই আনুমান করা যায়।

এটি শুধু জামালপুর নয়, গোটা ময়মনসিংহ বিভাগের প্রত্রপর্যটনের অন্যতম আকর্ষণীয় নির্দশন হিসেবে পরিচিতি লাভ করতে পারে নিঃসন্দেহে।

মেলানদহের ঐতিহাসিক তিনগম্বুজ মসজিদ
মেলানদহ উপজেলার ঐতিহাসিক দুর্মুট গ্রামে তিনগম্বুজ জামে মসজিদটি অবস্থিত। এই মসজিদটি প্রায় ১৫০ বছরের প্রাচীন। মসজিদটি বাংলা ১২৭৬ সালে নির্মাণ করেন জামালপুর জেলার বিশিষ্ট দানবীর মাদারগঞ্জের তালুকদার বংশের প্রতিষ্ঠাতা হাজি ফাজেল মাহমুদ তালুকদার। মসজিদটি নির্মাণের পর ১৩০৪ সালে ভয়াবহ ভূমিকম্পে তা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ওই বছরেই আবার তা সংস্কার করা হয়। এতে ব্যয় হয় ৮ হাজার রৌপ্যমুদ্রা। মসজিদটি নির্মাণক্ষেত্রে ছিল ইসলামি স্থাপত্যকলা ফুটে উঠেছে। তিন গম্বুজের পাশাপাশি মসজিদের চার কোণে চারটি সুদৃশ্য মিনার রয়েছে। সেই সময়কার চুন সুরক্ষিত গাঁথনির জন্য ময়মনসিংহের আকৃয়া থেকে সুদৃশ্য রাজমিষ্ঠি নিয়ে আসা হয়েছিল। গম্বুজের কারুকাজ করার জন্য চীন থেকে সিরামিক টুকরো নিয়ে আসা হয়। গম্বুজের চূড়ায় বসানো হয় পিতলের কলসি।

মসজিদের কার্নিশগুলিতে বর্ণিত স্থাপত্যকলার চিহ্ন রয়েছে। মসজিদের দরজায় রয়েছে বর্ণিত চিত্রকলা।



আরবি হরফে লেখা। জানালায় রয়েছে কারুকাজময় নকশা। কয়েকবার সংস্কারের ফলে আগের সৌন্দর্য অনেকাংশে ঢাকা পড়েছে।

হাজি ফাতেল মাহমুদ ১৯১৯ সালের ৫ ডিসেম্বর মৃত্যুবরণ করলে মসজিদের পাশে তাকে সমাধিত করা হয়। তার মৃত্যুর পর তার ছেলেরা এই মসজিদটি কয়েকবার সংস্কার করেন।

এই ঐতিহাসিক মসজিদটি বর্তমানে বয়সের ভারে ঝুঁকিগূর্ঞ হয়ে পড়েছে। ছাদ ও কলাম ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়েছে। যেকোনো মুহূর্তে এটা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। বর্তমানে একটু বৃষ্টি হলেই ছাদ চুয়ে পানি পড়ে। এই প্রাচীন মসজিদটি প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে সংরক্ষণের দাবি জানাচ্ছেন তাঙ্গুকদার পরিবারসহ এলাকাবাসী।

ঐতিহাসিক হযরত শাহ কামালের মাজার

হযরত শাহ কামালের (র.) মাজার জামালপুর জেলার এক ঐতিহাসিক প্রাচীন ধর্মীয় নিদর্শন। এটি মেলান্দহ উপজেলার ব্রহ্মপুত্র নদের দক্ষিণ তীরে ঐতিহাসিক দুরমুট গ্রামে অবস্থিত। ময়মনসিংহ জামালপুর, শেরপুর, নেতৃকেন্দ্র জেলা সম্পর্কিত ইতিহাস ও লোক সংস্কৃতির বিভিন্ন বই-পুস্তক থেকে জানা যায় যে, হযরত শাহ কামাল (র.) ১৫০৩ খ্রিস্টাব্দে আরবের ইয়েমেন থেকে এই অঞ্চলের সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা ও পাহাড় বেষ্টিত মনোরম পরিবেশে ব্রহ্মপুত্র নদীর তীরে তপোবন স্থাপন করে নিরন্তর ধ্যানমগ্ন থাকেন। আগে আস্তে তার অনেকাংশে ক্ষমতা ও অধ্যাত্মিক গুণাবলীর কথা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

এছাড়া স্থানীয় জনশ্রুতি ও লোকসাহিত্যের মাধ্যমে জানা যায় যে, তার আধ্যাত্মিকতায় মুঝ হয়ে স্থানীয় হিন্দু রাজা বারইয়ের কন্যা হযরত শাহ কামালের (র.) সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। এখন সেখানে বারইকান্দি গ্রাম ও বারোই বিবির মাজার বিদ্যমান। তখন থেকেই অত অঞ্চলের রাজা-জমিদার এবং পরবর্তীতে মোগল সম্রাটগণ তাদের সম্মানে বেশ কিছু এলাকা লাখেরাজ করে দেয়। পরবর্তী সময়ে ১৬৪৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি পরলোকগমন করেন।

অতঃপর সেখানে ভক্তদের দ্বারা মসজিদ, মাজার ইত্যাদি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সেখানে বছরের নিদিষ্ট সময়ে হযরত শাহ কামালের (বহ.) স্মরণে বিরাট ইসলামি জলসার বা আলোচনার আয়োজন করা হয়ে থাকে; যেখানে সারা দেশ থেকে হাজার হাজার ভক্ত আশেকানগণ জমায়েত হয়ে থাকেন। এটি ধর্মীয় প্রত্পর্যটন হিসেবে অনন্য নিদর্শন।

ঐতিহ্যবাহী বড় মসজিদ

জেলা সদর জামালপুর শহরের মাঝাখানে ঐতিহাসিক এই বড় মসজিদটি অবস্থিত। সন্তুষ্ম শতকের শেষ দিকে ইংরেজ আমলে কিছু স্থানীয় ব্যবসায়ীরা এটি নির্মাণ করেন। ওই সময় জামালপুরে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একটি সেনানিবাস ছিল; সেখানে রুটি সরবরাহকারী ছিলেন 'মহান্দদ নন্দ' কুটিয়োলা, তিনিই পাকা মসজিদটি প্রতিষ্ঠা করেন। তখন থেকেই মসজিদটি পাকা মসজিদ নামে পরিচিত ছিল। তিনি মসজিদটি রং, সুন্দর ও স্বচ্ছভাবে পরিচালনার জন্য বেশ কিছু সম্পত্তি দান করে ওয়াকফ করে দিয়েছিলেন। মসজিদের শিলালিপি থাকলেও ১৩০৪ সনের ভূমিকম্পের সময় ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং তা হারিয়ে যায়। পরবর্তী সময়ে এখানে বড় আকারের আধুনিক মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে। যেটা স্থানীয় ব্যবসায়ী ধর্মপ্রাণ মুসলিমান নাম্বু মিয়ার উদ্যোগে ও মুসলিম সম্প্রদায়ের সহযোগিতায় চুনসুরকির তিনগঞ্জুজ বিশিষ্ট একটি বড় আকারের মসজিদ নির্মিত হয়। সেই থেকে এই ঐতিহাসিক মসজিদটির নামকরণ হয়ে যায় বড় মসজিদ।



স্থানীয় জনশ্রুতি ও লোকসাহিত্যের মাধ্যমে জানা যায় যে, হযরত শাহ কামালের (র.) ১৫০৩ খ্রিস্টাব্দে আরবের ইয়েমেন থেকে এই অঞ্চলের সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা ও পাহাড় বেষ্টিত মনোরম পরিবেশে ব্রহ্মপুত্র নদীর তীরে তপোবন স্থাপন করে নিরন্তর ধ্যানমগ্ন থাকেন। আগে আস্তে তার অনেকাংশে ক্ষমতা ও অধ্যাত্মিক গুণাবলীর কথা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

প্রত্নপর্যটক তথা ভ্রমণপিপাসুদের জন্য খুবই আকর্ষণীয় স্থান এই দ্যামায়ী মন্দির। এটি আরও ইতিহাস সমূক করে সংরক্ষণ ও সুন্দর করে উপস্থাপন করতে পারলে একদিকে দেশের বৃহৎ সনাতনী হিন্দু সম্প্রদায়ের কাছে একটি আকর্ষণীয় প্রতীক হবে এবং সেই সাথে স্থানীয় শিক্ষিত বেকার জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে।

ঐতিহাসিক খ্রিস্টান সমাধি

পরবর্তী সময়ে মসজিদ কমিটি মুসলিমদের স্থান সংকলনের অভাবে বছর দশকে আগে পুরোনো মসজিদটি ভেঙে তিনতলা বিশিষ্ট নতুন মসজিদ তৈরি করেছে। তবুও ঐতিহাসিক বড় মসজিদটি দেখতে ও নামজ আদায় করতে হাজারো মুসলিম পর্যটকদের ভিড় দেখা যায়।

ঐতিহ্যবাহী দ্যামায়ী মন্দির

জামালপুর জেলা শহরের জিরো পয়েন্টে অবস্থিত দ্যামায়ী মন্দির। ঐতিহ্যবাহী এই মন্দির সম্পর্কে বিস্তারিত তেমন কিছু দালিলিক তথ্য পাওয়া যায় না। তবে স্থানীয়ভাবে যে গল্প বা মুখে মুখে ইতিহাস প্রচলিত আছে তা হলো, '১৬৯৬ খ্রিস্টাব্দে জামালপুর জেলা শহরের জিরো পয়েন্টে প্রায় ৬৫ শতাংশ জমির ওপর নির্মিত হয় ঐতিহ্যবাহী দ্যামায়ী মন্দির।' নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর আমলে শ্রীকৃষ্ণ রায় চৌধুরী এই মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেন। এটি প্রায় ৩২১ বছরের পুরোনো মন্দির। এই মন্দিরে প্রতিদিনই বিভিন্ন পূজা অর্চনার আয়োজন করা হয়ে থাকে এবং প্রতিবছর অষ্টমী মেলায় আগত হিন্দুধর্মবলঘীরা বিভিন্ন দেবতার উদ্দেশ্যে মানত করে থাকেন। এই মন্দিরে আলাদাভাবে শিব, নাটমন্দির, কালি এবং মনসা দেবীর মন্দির স্থাপনা করা হয়েছে। এই মন্দিরে

রয়েছে শতবর্ষ পুরোনো কারুকার্য খচিত বিভিন্ন দৃষ্টিনন্দন শিল্পকর্ম। এই শিল্পকর্ম এবং মন্দিরের অপার সৌন্দর্য দেখতে হাজার হাজার পর্যটক প্রতিবছর এই মন্দিরে আসেন। এই পর্যটকদের জন্য এই ঐতিহাসিক মন্দিরটি সকাল ৬টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত খোলা থাকে।

প্রত্নপর্যটক তথা ভ্রমণপিপাসুদের জন্য খুবই আকর্ষণীয় স্থান এই দ্যামায়ী মন্দির। এটি আরও ইতিহাস সমূক করে সংরক্ষণ ও সুন্দর করে উপস্থাপন করতে পারলে একদিকে দেশের বৃহৎ সনাতনী হিন্দু সম্প্রদায়ের কাছে একটি আকর্ষণীয় প্রতীক হবে এবং সেই সাথে স্থানীয় শিক্ষিত বেকার জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে।

ঐতিহাসিক খ্রিস্টান সমাধি

জামালপুর শহরের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে, সরকারি আশেকের মাহমুদ কলেজে প্রবেশমুখের উভর পাশে ঐতিহাসিক খ্রিস্টান সমাধিক্ষেত্রটির অবস্থান। ঐতিহাসিকভাবে জানা যায়, পলাশীর যুক্তে বাঙালি জাতি পরাজিত হয়ে তৎকালীন বাংলার রাজধানী মুর্শিদাবাদ থেকে অনেকেই এই ভাটির দেশের বিভিন্ন স্থানে আশ্রয় নেয় এবং সময় সুযোগ বুরো তারা ব্রিটিশ বিবেৰী আন্দোলনের মাধ্যমে ইংরেজদের বিরুদ্ধে (১৭৬০-১৮০০ খ্রি. পর্যন্ত) বিভিন্ন ধরনের আন্দোলন করতে থাকে; ফকির বিদ্রোহ তাদের অন্যতম। এ সকল বিদ্রোহ দমনের জন্য এই অঞ্চলের তৎকালীন সিংহজানী তথ্য বর্তমানে ইংরেজদের বিরুদ্ধে (১৭৬০-১৮০০ খ্রি. পর্যন্ত) বিভিন্ন ধরনের আন্দোলন করতে থাকে; ফকির বিদ্রোহ দমনের জন্য এই অঞ্চলের তৎকালীন ধর্মসমূহের প্রশংসন প্রাকৃতিক দুর্যোগের সাথে মোকাবেলা করে এবং যুক্তে নিহত হয়, তাদেরকে এখানে খ্রিস্টান করবরাসনে সমাহিত করা হয়। জামালপুরের মানুষ এই এলাকাটি কে কম্পপুর বলে ডেকে থাকে; যেহেতু একসময় এখানে ইংরেজ সৈন্যদের ক্যাম্প ছিল তাই।

এই অঞ্চলে ফকির ও সন্ন্যাসী বিদ্রোহের অবসান হলে জামালপুর সেনাবাহিনী রংপুরে স্থানান্তর করা হয়। অনেকগুলো সমাধি ধ্বংস হয়ে গেলেও এখানে বেশ কয়েকটি বড় বড় পুরোনো ইটের তৈরি সমাধি এখনও আছে এবং তাতে এপিটাফ রয়েছে। সেগুলোর পাঠান্দাৰ করা প্রায় অসম্ভব। তারপরেও এটি দেখা জন্য দেশ-বিদেশের পর্যটকদের ভিড় লক্ষ্য করা যায়। সুতরাং এই খ্রিস্টান করবরাসন সঠিক সংরক্ষণ এবং সংস্কারের মাধ্যমে উপস্থাপন করতে পারলে একদিকে প্রত্নপর্যটনের বিকাশ হবে

অপরদিকে সরকারের রাজস্ব আয় বৃক্ষি পাবে এবং সেই সাথে স্থানীয় শিক্ষিত বেকার জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে বলে আমার বিশ্বাস। ঐতিহাসিক গান্ধী আশ্রম

জামালপুর শহরের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে, সরকারি আশেক মাহমদ কলেজে প্রবেশমুখের উত্তর পাশে ঐতিহাসিক খ্রিস্টান সীমান্তক্ষেত্রটির অবস্থান। বিটিশ শাসিত ভারতবর্ষে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্তির লক্ষ্যে মহাত্মা গান্ধীর ডাকে সাড়া দিয়ে জামালপুর শহরের পশ্চিম প্রান্তে শ্রুত্বপুত্র নদীর তীরে ১৯৩৪ সালে গড়ে ওঠে ঐতিহাসিক গান্ধী আশ্রম। তার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন কিংবদন্তি কৃষ্ণক নেতা নাসির উদ্দিন সরকার। তার সুযোগে জ্যেষ্ঠা কন্যা রাজিয়া খাতুন ছিলেন আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক। আশ্রমের কার্যক্রমের ছিল চরকায় সুতা কেটে খালি কাপড় বোনা থেকে স্বাস্থ্য সেবাসহ বন্দেশের হিতবৃত্তে বিবিধ কর্মসূচি পালন করা। পাকিস্তান আমলে অর্ধে ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর প্রতিষ্ঠানটির অবহেলায় ধ্বংসের মুখে পতিত হলেও ২০০৭ সাল থেকে আবার এর কার্যক্রম শুরু হয় এবং এখন এই অঞ্চলে মহাত্মা গান্ধীর আশ্রম একটি অন্যতম আকর্ষণীয় স্থান হিসেবে পর্যটকদের সাড়া জাগিয়েছে। সুতরাং জামালপুর জেলার তথ্য বৃহস্পতির ময়মনসিংহ অঞ্চলের পর্যটন বিকাশে মহাত্মা গান্ধীর আশ্রম হতে পারে অন্যতম আকর্ষণীয় স্থান।

ঐতিহাসিক দালানি জামে মসজিদ

জামালপুর জেলা শহরের জিরো পয়েন্ট থেকে উত্তর-পশ্চিমে সীমান্তবর্তী বকশীগঞ্জ উপজেলার নিলক্ষ্মীয়া জোড়দারবাড়ির ঐতিহাসিক দালানি জামে মসজিদিটির অবস্থান।

নিলক্ষ্মীয়ার ঐতিহ্যবাহী দালানি জামে মসজিদিটি জামালপুর জেলার প্রায় ৩০ কি.মি উত্তরে, গারো পাহাড়ের সুবুজ বেষ্টনীর অপূর্ব সৌন্দর্যে ঘেরা বকশীগঞ্জ উপজেলাধীন ৬ কি.মি দক্ষিণ দিকে অবস্থিত নিলক্ষ্মীয়ার সাবেক অবিভক্ত বাংলার এম এলসি মরহুম আজিজুর রহমান নান্না মিহার পিতা মরহুম মন্দির উদ্দিন শেখের অন্যতম কীর্তি নিলক্ষ্মীয়া জোড়দার বাড়ির দালানি জামে মসজিদ বা বড় মসজিদ নামেও পরিচিত।

শেখের একক প্রচেষ্টায় ও অক্রান্ত পরিশ্রমে আঠারো শতকের শেষের দিকে নির্মিত এই মসজিদ আমাদের তৎকালীন স্থাপত্যকলার এক অপূর্ব ও ঐতিহ্যবাহী নির্দেশন। এই মসজিদখনা স্থানীয় মুসলিমদের এবং জোড়দারবাড়ির কর্মসূচির নামাজ আদায়ের সুবিধার্থে নির্মিত হয়েছিল। সম্পূর্ণ দৈর্ঘ্য উপাদানের এবং স্থানীয় দক্ষ রাজমন্ত্রি দ্বারা দীর্ঘ ছয় বছরে বিশেষ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন করে নির্মাণ করা হয়। এই দালানি মসজিদটি। এই মসজিদ আমাদের সেই গোরবময় ইতিহাস ও ঐতিহ্যের কথাই যেন বারবার মনে করিয়া দেয়। আঠারো শতকের নির্মিত প্রাচীর বেষ্টিত এই মসজিদের দৈর্ঘ্য ৭০ ফুট এবং প্রস্থ ৩০ ফুট। মসজিদটিতে বড় তিনটি এবং ছোট কয়েকটি গম্বুজ অপূর্ব শোভ বর্ধন করে রেখেছে। এর দরজার সংখ্যা আটটি। প্রাচীর বেষ্টনীর ঠিক মধ্য ব্রাবার রয়েছে চোখ ধাঁধানো মনোমুক্তকর ফটক। মুসলিম এই ফটক দিয়েই মসজিদে প্রবেশ করে।

মসজিদখনার ভেতরে ও বাইরে নির্মাণ কলাকৌশল অপূর্ব। এই কারুকার্যময় মসজিদটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য মরহুম মন্দির উদ্দিন সাহেব কিছু ভূমি ওয়াকফ করে দিয়েছিলেন।

দুঃখের বিষয় হচ্ছে- কালের আবর্তে নিলক্ষ্মীয়ার ঐতিহ্যবাহী এবং জন অধুনায় এলাকা যেন আরও ঘন হয়ে উঠলো, মুসলিম সংখ্যা পর্যায়ক্রমে বেড়েই চললো, সবার প্রাণের মসজিদে আর জায়গা



সংকুলান হয় না; ফলে এলাকার সর্বস্তরের জনগণের সহযোগিতায় মসজিদ কমিটি তৃতীয় তলা পর্যন্ত বাড়ানোর সিদ্ধান্ত হয়। অপূর্ব কারুকাজ খচিত এবং গম্বুজগুলো ভেঙে ফেলা হয়। নির্মাণকাজ সমাপ্ত হওয়ার পর ছবি তোলে গম্বুজ এবং কারুকাজ ঠিক রাখা হয়।

মহারাজা প্রদ্যুত্কুমার ঠাকুরের কাছারি ভবন

জামালপুর জেলা শহরের জিরো পয়েন্ট থেকে ৩০ কি.মি উত্তর-পশ্চিমে সীমান্তবর্তী বকশীগঞ্জ উপজেলার ঐতিহাসিক মহারাজা প্রদ্যুত্কুমার ঠাকুরের কাছারি ভবন নামে অন্যান্য স্থাপনার ধর্মস্থানের অবস্থান।

বকশীগঞ্জের পূর্ব নাম ছিল রাজেন্দ্রগঞ্জ। ইংরেজ আমলে পাতিলাদহ পরগনা রাজেন্দ্রগঞ্জ মহারাজা প্রদ্যুত্কুমার ঠাকুরের জমিদারের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

সত্ত্বেও ১৭ শতকের মধ্যভাগে পাতিলাদহ পরগনার রাজেন্দ্রগঞ্জে মহারাজা খাজনা আদায়ের জন্য এই কাছারি ভবন নির্মাণ করেন। এই পাতিলাদহ পরগনা পূর্ব ময়মনসিংহ থেকে রংপুর জেলা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তখন রংপুর জেলা কালেক্টরে রাজস্ব প্রদান করা হতো। বকশীগঞ্জের এই কাছারি ভবন সম্পর্কে নানান রকমের জনশ্রুতি রয়েছে। এক সময় এখানে হাতিঘোড়া বাঁধা থাকতো। শোনা যায়, কাছারি বাড়ির সামনে দিয়ে কেউ জুতা পায়ে, ছাতা মাথায় দিয়ে হেঁটে যেতে পারতো না।

এখনকার কাছারি ভবনটি ঢাকার লালবাগ কেল্লার

আদলে নির্মিত। সময়ের কঠিন বাস্তবাত্য ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণেও আজ এগুলো ধ্বংসের শেষ প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে। তবুও কালের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা স্মৃতি চিহ্নগুলোকে সুষ্ঠুভাবে সংরক্ষণ করে পর্যটকদের সামনে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করতে পারলে একদিকে যেমন এই অঞ্চলের প্রতিপথটির বিকাশ হবে অপরদিকে একই সাথে স্থানীয় শিক্ষিত বেকার জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং সরকারের রাজস্ব আয় বৃক্ষি পাবে বলে আশা করা যায়।

অন্যান্য দর্শণীয় স্থান

ফুলকোচা ও মহিরামকুলে অবস্থিত জমিদারদের কাচারি (বিলগুপ্তপ্রায়) ও দীঘি (মেলানদহ উপজেলা), তারতাপাড়া গ্রামের বিলগুপ্তপ্রায় নীলকঠি (মাদারগঞ্জ উপজেলা), নরপাড়া দুর্গ (সরিয়াবাড়ী উপজেলা), রাধানাথ জিউর মন্দির, নান্দিনার শোলাকুড়ি পাহাড়, শ্রীপুরের রানীপুরুর দীঘি, চন্দ্রার হরিশচন্দ্রের দীঘি (জামালপুর সদর উপজেলা), প্রদ্যুত্কুমার ঠাকুরের কৃষ্ণবাড়ি (ইসলামপুর উপজেলা), গারো পাহাড় (বকশীগঞ্জ উপজেলা) ইত্যাদি প্রত্নতাত্ত্বিক নির্দশন রয়েছে। এগুলোর সঠিক ব্যবস্থাপনা করতে পর্যটকদের সামনে সন্দরভাবে উপস্থাপন করতে পারলে স্থানীয় প্রত্নপর্যটন বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়।

লেখক: উপপরিচালক কাম কিপার, জাতিতাত্ত্বিক জাদুঘর ◆



10th ASIAN TOURISM FAIR

September 21 22 23 , 2023

REGISTRATION

You are requested to fillup the registration form for confirming your booth & send to fair secretariat :

**House - 97/1, Flat - 2B, Sukrabad
Sher-E-Bangla Nagar,Dhaka-1207
Bangladesh.**

E-mail : asiantourismfair@gmail.com
Phone : +88 02-222242944

CONTACT

Mr. Mohiuddin Helal
Chairman, ATF Dhaka
E-mail : info@asiantourismfair.com
Mobile : +88 01819224593

Mr. Borhan Uddin
Fair Director, ATF Dhaka
Mobile : +88 01730450099 (BD)

DMCL Desert Express Travel & Tours LLC

Office no : 105, 1st floor, Plot no 589-0
Bruj Nahar Views Building
Deira, Dubai, U.A.E
Mobile : +97154 400 8920

Hotline: +88 01970004447
www.asiantourismfair.com

বাংলাদেশি পর্যটকদের নয়া গন্তব্য জাপান

■ পর্যটন বিচিত্রা ডেস্ক

জাপান ব্যবহৃত হলেও সারা বিশ্বের ভ্রমণ পিয়াসুর পছন্দের শীর্ষে থাকে সুর্যোদয়ের দেশটি। তবে বেশিরভাগ বাংলাদেশি পর্যটকরা ভ্রমণের জন্য বেছে নেন প্রতিবেশী ভারত, মালদ্বীপ, শ্রীলঙ্কা কিংবা থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুরসহ নির্ধারিত কিছু দেশ। এতদিন কেবল স্টুডেন্ট কিংবা বিজেনেস ভিসায় জাপানে যেতেন, সেই সংখ্যাটাও ছিল খুবই নগণ্য।

তবে খুশির খবর হলো- বাংলাদেশি পর্যটক বাড়তে উদ্যোগ নিয়েছে জাপান। সে অনুযায়ী নেমেছে প্রচারণায়। শুধু তাই নয়, এজন্য চালাচ্ছে গবেষণায়।

ভিসা প্রক্রিয়াও আরও সহজ করা হবে। জাপানের বিভিন্ন স্থাপনা ছাড়াও, সংস্কৃতি, খাবারসহ গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসূত্র তুলে ধরতে ঢাকায় জাপান দুর্বাসের এমন উদ্যোগ নিয়েছে। যেখানে বাংলাদেশি মুসলমানদের কথা বিশেষ বিবেচনায় নিয়ে হালাল খাবার, গুরুত্বপূর্ণ এলাকাগুলোতে নামাজের স্থানের তথ্যও তুলে ধরা হয়েছে। এমন উদ্যোগে দুদেশের সম্পর্ক আরো গভীর হবে বলে বিশ্বাস সংশ্লিষ্টদের। গবেষণার অংশ হিসেবে বঙ্গবন্ধু সঙ্গেলন কেন্দ্রে মার্চের প্রথম সপ্তাহে হয়ে গেল পর্যটন মেলা। আগতদের কাছ থেকে নানা তথ্যও সংগ্রহ করছে জাপানি দূতাবাস। এর ফলে বাংলাদেশি পর্যটকদের এখন নতুন গন্তব্য হতে যাচ্ছে সুর্যোদয়ের এই দেশ।

জাপান গত বছরের অস্টোবরে সীমান্ত উন্মুক্ত করে দিয়েছে। এরপর দেশটির পর্যটন খাতে গতি ফিরেছে। এরই ধারাবাহিকতায় আগামী ২০২৫ সালে

রেকর্ড সংখ্যক বিদেশি পর্যটক ঢানতে চায় জাপান। জানা গেছে, এই খাতটিকে আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে গত ৯ ফেব্রুয়ারি খসড়া পরিকল্পনা প্রকাশ করেছে জাপান সরকার। পরিকল্পনা অনুযায়ী, দেশটিতে ২০২৩-২৫ অর্থবছরে পর্যটন খাতে মাথাপিছু ব্যয় বেড়ে উচ্চীত হবে ১ হাজার মুঠ ডলারে। ২০১৯ সালের তুলনায় যা ২৫ শতাংশ বৃদ্ধি। আগামী বছরগুলোয় এক্সপ্রো ২০২৫-এর মতো বেশকিছু আন্তর্জাতিক সঙ্গেলন অনুষ্ঠিত হবে জাপানে।

স্বাভাবিকভাবেই আন্তর্জাতিক উড়োজাহাজ ভ্রমণের অন্যতম প্রধান গন্তব্যে পরিগত হবে দেশটি।

জাপান ২০১৯ সালেও ৩ কোটি ১৮ লাখ ৮০ হাজার পর্যটকের গন্তব্য ছিল। কিন্তু করোনার কারণে পরের বছরে বড় ধরনের অবনমন ঘটে। ২০২০ সালে

পর্যটক নামে ৪১ লাখ ২০ হাজার ও ২০২১ সালে ঠেকে ২ লাখ ৫০ হাজারে। তবে শুধু সংখ্যার দিকে মনোযোগ না দিয়ে জাপান সরকার কৌশলগত পরিবর্তন আনতে চায় পর্যটন খাতে।

প্রধান শহরগুলোর বাইরেও দেশের অন্যান্য অংশে ভ্রমণের জন্য স্থাব্য উপায়ে পর্যটকের জন্য আকর্ষণীয় করে তুলছে। দেশটির প্রধানমন্ত্রী ফুমিও কিশিন্দা ঘোষণা দিয়েছেন- পর্যটন খাতে ৫ ট্রিলিয়ন ইয়েন ব্যয় করা হবে।

জাপানের ভিসার খুঁটিনাটি

জাপান সরকার জাপানে একটি সম্পূর্ণ নতুন ইলেক্ট্রনিক ভ্রমণ ব্যবস্থা চালু করার পরিকল্পনা



করছে; যাতে পর্যটকরা দেশটিতে যাওয়ার অনুমতির জন্য অনলাইনে আবেদন করতে পারেন। প্রতিমাসে প্রায় ত্রিশ লাখ বিদেশি পর্যটকের সঙ্গে, জাপানি কর্মকর্তারা বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নাগরিকদের ভিসা প্রদানের প্রক্রিয়াটিকে সহজতর করতে চাইছে।

যখন জাপানের জন্য ই-ভিসা আনুষ্ঠানিকভাবে চালু হয়, তখন থেকে বিশ্বের বেশিরভাগ দেশকে জাপানে যাওয়ার অনুমতি পাওয়ার জন্য এই ই-ভিসা প্রক্রিয়াটি গ্রহণ করতে হবে। বাংলাদেশ থেকে জাপানে যেতে ইচ্ছুক থেকে ব্যক্তির অবশ্যই ভিসা থাকতে হবে নতুবা তাদের জাপানে প্রবেশ করতে পারেন না।

বাংলাদেশ থেকে আসা প্রতিটি ভ্রমণকারীর যে ধরনের জাপানি ই-ভিসার প্রয়োজন তা নির্ভর করবে প্রধানত তাদের ভ্রমণের উদ্দেশ্য এবং কতদিন তারা জাপানে থাকার পরিকল্পনা করছেন তার ওপর।

জাপানের ই-ভিসা প্রয়োজনীয়তা

বাংলাদেশি নাগরিকদের জন্য জাপানের অন্য যেকোনো ভিসা আবেদনের থেকে খুব বেশি আলাদা নয়। ন্যূনতম ছয় মাসের মেয়াদ পশাপাশি ন্যূনতম দুটি ফাঁকা পৃষ্ঠাসহ একটি বাংলাদেশি পাসপোর্ট। বাংলাদেশি ভ্রমণকারীর সাম্প্রতিক পাসপোর্ট-স্টাইলের ছবির একটি ডিজিটাল কপি। জাতীয় পরিচয়পত্র। উদাহরণস্বরূপ, একটি ড্রাইভিং লাইসেন্স বা একটি জন্ম শংসাপত্র। বাংলাদেশের আবেদনকারী বিবাহিত হলে একটি বিবাহের শংসাপত্র।

বাংলাদেশিদের প্রবেশের তারিখ, জাপানে আবাসন এবং পরবর্তী ভ্রমণের প্রমাণ সম্পর্কিত বিশদ বিবরণসহ একটি ভ্রমণপথ।

বাংলাদেশি নাগরিকরা জাপানে তাদের ভ্রমণের জন্য অর্থায়নের জন্য দুটি বিকল্প ব্যবহার করতে পারে। তহবিলের প্রমাণ দেখায় এমন একটি নথি সরবরাহ করা এবং স্পসর বা গ্যারান্টারের সাথে ভ্রমণ করা। আপনি যদি কোনো স্থানীয় স্পনসরের সহায়তায় জাপানে ভ্রমণ করেন, তাহলে আপনাকে অবশ্যই উপরোক্তিহীন বিষয়গুলো ছাড়াও আরও নথি প্রদান করতে হবে। জাপানি পৃষ্ঠাপোক বা গ্যারান্টার এবং বাংলাদেশ থেকে আসা ভ্রমণকারীর মধ্যে সম্পর্কের বিস্তারিত নথি।

একটি চিঠিতে বিশদ বিবরণের প্রমাণ। যেমন যদি উপরোক্ত নথিপত্রগুলি প্রমাণ করে ব্যাক স্টেটমেন্ট যা প্রমাণ করে যে জাপানের গ্যারান্টার প্রকৃতপক্ষে

ঢাকায় জাপান দুতাবাসের ঠিকানা

প্লট: ৫ ও ৭, দুতাবাস রোড
বারিধারা, ঢাকা।

ফোন: +৮৮০২২২২২৬০০১০ ইটলাইন:

+৮৮০১৮৭৮০৮৮৪২৫

ইমেইল: consular@dc.mofa.go.jp



কেন ঘুরতে যাবেন ইন্দোনেশিয়া

■ পর্যটন বিচিন্ন্যা ডেস্ক

ইন্দোনেশিয়ার প্রতি ভ্রমণপিপাসুদের আকর্ষণ সব সময় আছে। এশিয়ার অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় বেশ কম খরচেই অমগ করা যেতে পারে এই দেশটিতে। এই গ্রীষ্মে যদি দেশের সীমানা পেরিয়ে কোথাও ঘুরতে যাওয়ার পরিকল্পনা করে থাকেন, তাহলে বেছে নিতে পারেন ১৭ হাজারেরও বেশি দ্বীপ আর বৈচিত্র্যের সংস্কৃতির দেশ ইন্দোনেশিয়াকে। ভ্রমণে কেন এই দেশটিকে বেছে নেবেন তার কিছু কারণ এখানে উল্লেখ করা হলো-

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য

বিশ্বের সবচেয়ে সুন্দর কিছু প্রাকৃতিক আকর্ষণের দেখা মিলবে ইন্দোনেশিয়ায়। বালির সবুজ ধানখেত থেকে শুরু করে রাজা আমপাটের নীলাভ জলজ ইন্দোনেশিয়ার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য শ্বাসকর্দ্দক। এরমধ্যে অন্যতম কয়েকটি আকর্ষণ হচ্ছে মাউন্ট ব্রোমো, কমোডো দ্বীপপুঁজি এবং বান্দা দ্বীপপুঁজি।

সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য

ইন্দোনেশিয়ায় শত শত ভিন্ন সংস্কৃতি রয়েছে এবং এর প্রতিটির নিজস্ব আর স্বতন্ত্র অনুশীলন, বৃত্তিশীল ও বিশ্বাস আছে। বোরোবুদুরের ঐতিহাসিক মন্দির থেকে শুরু করে বালির ঐতিহ্যবাহী নৃত্য ইন্দোনেশিয়ার সমুক্ত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সবই উপভোগ্য। বিভিন্ন উৎসবে যোগদান, যাদুঘরে যাওয়া এবং স্থানীয় খাবারের স্বাদ নেওয়ার মাধ্যমে দারুণ কিছু মুহূর্ত পেতে পারেন পর্যটকরা।

মজাদার খাবার

ইন্দোনেশিয়ার বিভিন্ন সুস্বাদু খাবার যে কারো জিভে জল নিয়ে আসার মতো। নাসি গোরেং (ফ্রাইড রাইস), সাতে (গ্রিলড মাংস দিয়ে তৈরি), গাড়ো-গাড়ো (পিনাট সস দিয়ে তৈরি সবজির সালাদ) এমন কয়েকটি সুস্বাদু খাবার। ইন্দোনেশিয়ার খাবারের দামটাও বেশ নাগালের মধ্যে। কম বাজেটেই পর্যটকরা উপভোগ করতে পারবেন মজাদার সব খাবার।

অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজম

যারা অ্যাডভেঞ্চার ভালোবাসেন তাদের জন্য ইন্দোনেশিয়া স্বর্গের মতো। রেইনফরেস্ট হাইক, হোয়াইটওয়াটার রাফটিং, সক্রিয় আন্দোলনগারিতে আরোহণ করা, কমোডো দ্বীপে ডাইভিং পর্যটকদের জন্য উন্মুক্ত এখানে।

আতিথেয়তা

ইন্দোনেশিয়ানরা তাদের বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ ও উদার অভ্যর্থনার জন্য বিখ্যাত। পর্যটকরা তাদের কাছ থেকে পরিবারের মতো আন্তরিকতা ও হাসিমুখ উপহার পান সবসময়। স্থানীয়রা সবসময় পর্যটকদের বেড়ানোর কাজে সহায়তা করতেও আগ্রহী।

সাশ্রয়

ইন্দোনেশিয়ায় স্বল্প খরচে থাকার জায়গা, খাবার ও পরিবহনের সুবিধা রয়েছে। ফলে এটি একটি সাশ্রয়ী ভ্রমণ গন্তব্য হয়ে উঠেছে। স্বাচ্ছন্দ্য ও গুণমান বজায় রেখেই কম খরচে দেশটি ঘুরে দেখতে পারবেন। টেকসই প্রচেষ্টা

প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষা ও দুষ্প্র কমানোর কর্মসূচি নিয়ে ইন্দোনেশিয়া টেকসই প্রচেষ্টায় অগ্রসর হচ্ছে। পরিবেশবান্ধব ভ্রমণ ও থাকার জায়গার জন্য ইন্দোনেশিয়া একটি চমৎকার স্থান। ভ্রমণকারীরা এই উদ্যোগকে সহায়তা করতে পারেন।



ইন্দোনেশিয়ার ভিসা তথ্য

বাংলাদেশের পাসপোর্ট দিয়ে বিশ্বের অনেকগুলো দেশে ভিসা ছাড়াই ভ্রমণ করা যায়। আর এর মধ্যে একটি দেশ হলো- দ্বীপ রাষ্ট্র ইন্দোনেশিয়া। স্বত্বত ১০১৬ সাল থেকে বাংলাদেশিরা ইন্দোনেশিয়ায় ভিসা ছাড়া ভ্রমণের সুবিধাটি ভোগ করে আসছেন।

ফলে বাংলাদেশিদের ইন্দোনেশিয়া ভ্রমণের জন্য আগে থেকে ভিসা নিতে হয় না।

ইন্দোনেশিয়া ভ্রমণে বাংলাদেশিদের ভিসা লাগে না। ভিসা ছাড়া ইন্দোনেশিয়া ভ্রমণের সুযোগ নিতে হলে পাসপোর্টের মেয়াদ কমপক্ষে হ্যান মাস থাকতে হবে। ফিরতি টিকিট এক মাসের ভেতর হতে হবে। আর ভ্রমণকালীন সময়ের জন্যে সাথে যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ থাকতে হবে। ইমিগ্রেশন অফিসার জিজেস করলে দেখাতে হবে। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এখানে বলে রাখা ভালো- ইন্দোনেশিয়ায় ভ্রমণে গিয়ে কাজ করার বা সেখানে থেকে যাওয়ার কোনো সুযোগ নাই। এক মাস থাকার পরে সেখানে থাকার মেয়াদ বাড়ানোর কোনো সুযোগ নাই।

ইন্দোনেশিয়ায় বাংলাদেশ দূতাবাসের ঠিকানা

জেএল. জয়া মানদালা রায়া নং, ৯৩ মেনটেং দালাম, তেবেট, জাকাৰ্তা সেলতান-১২৭৮০ টেলিফোন: ৬২২১ ২২৮ ৩৫ ৮৭৬ এবং +৬২ ২২৮ ৩৫ ৮৭৭ হটলাইন: +৬২ ৮৭৭ ৭০০৬ ৬৮৮৯ এবং +৬২ ৮১৩ ৮৮৭০ ০৫২২

ইমেইল- mission.jakarta@mofa.gov.bd ◆

ঈদের ছুটিতে ঢাকায় কোথায় বেড়াবেন

স্টি

■ পর্যটন বিচিত্রা ডেক্স

ঈদের ছুটিতে ঢাকা শহর অনেকটাই ফাঁকা থাকবে। এ সময় নগরের সৌন্দর্য ভিন্নভাবে উপভোগ করার সুযোগ রয়েছে। ঢাকায় বিশ কিলোমিটার কেন্দ্র রয়েছে যেখানে ঈদ অবকাশে একটা দিন, কিছুটা সময় কাটাতে পারেন। জেনে নিন ঢাকার কয়েকটি জনপ্রিয় বেড়ানোর জায়গা সম্পর্কে।

জাতীয় চিড়িয়াখানা

ঈদের ছুটিতে রাজধানী মিরপুরের জাতীয় চিড়িয়াখানায় ঘুরে আসতে পারেন প্রাণিপ্রেমীরা। চিড়িয়াখানায় রয়েল মেসেন্স টাইগার থেকে শুরু করে বনের রাজা সিংহ পর্যন্ত বিভিন্ন ধরনের বন্যপ্রাণী থাকবে। জাতীয় চিড়িয়াখানায় প্রতি বছর প্রায় ৩০ লাখ মানুষ ভিড় করে।



স্বাধীনতা জাদুঘর ও জাতীয় জাদুঘর

ঈদের পরদিন বিকাল ৩টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত খোলা থাকছে জাদুঘর দুটি। আনন্দ ও দেশের ইতিহাস ঐতিহের সঙ্গে আরও একটু ভালোভাবে পরিচিত হতে ঈদের ছুটিতে সময় কাটিয়ে আসতে পারেন এখানে।

শিশুমেলা

শিশুমেলা অবস্থিত রাজধানীর শ্যামলীতে। এতে রয়েছে ৪০টির মতো রাইড। পরিবারের সবার চড়ার মতো আছে ১২টি রাইড। ঈদের প্রথম সাতদিন সকাল ১০টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত এটি খোলা থাকছে।

জাতীয় সংসদ ভবন

রাজধানীর মানিক মিয়া এভিনিউতে অবস্থিত জাতীয় সংসদ ভবনটি শুধু বাংলাদেশেই নয়, বিশ্বের অন্যতম সেরা স্থাপত্যশৈলীর উদাহরণ। আমেরিকান স্থপতি লুই কানের ডিজাইন করা অত্যধূমিক ভবনটি তার ব্যক্তিগতি আকার এবং নকশার জন্য জনপ্রিয়। ভবনটিতে সাধারণ মানুষের চলাচলে নিষেধাজ্ঞা থাকলেও আশপাশের পরিবেশ, কৃত্রিম লেক ও খাবারের দোকানগুলোতে বিকেলে ভিড় জমে।

রমনা পার্ক

রাজধানীর শাহবাগের মিন্ট রোড ও বেইলি রোড এলাকায় রয়েছে রমনা পার্ক। পার্কটিতে রয়েছে নানা ধরনের গাছগাছালি এবং সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশ। রমনা পার্ক হতে পারে আপনার পরিবারের সঙ্গে ভ্রমণ করার জন্য একটি আদর্শ জায়গা।

হাতিরবিল

যারা প্রকৃতিপ্রেমি বা প্রকৃতির কাছাকছি থাকতে চান তাদের জন্য উপযুক্ত হচ্ছে হাতিরবিল। এই ব্যস্ত শহরে হাতিরবিল হয়ে উঠেছে মনোরম এক বিনোদন কেন্দ্র। দিনে কিংবা রাতে যে কেউই ঘুরে আসতে পারেন হাতিরবিল। সন্ধ্যা হলেই বেশি জমে উঠে এই এলাকা। পুরো হাতিরবিল ঘুরে দেখতে



আরামদায়ক বাস সার্ভিসও রয়েছে।

লালবাগ কেল্লা

পুরান ঢাকার লালবাগে অবস্থিত এটি। মোগল আমলে স্থাপিত এই দুর্গটি একটি ঐতিহাসিক নির্দশন। দেশের অন্যতম জনপ্রিয় পর্যটনস্থলও এটি। পুরান ঢাকার ভিড় ঠেলে কেল্লার সদর দরজা দিয়ে চুকলেই চোখে পড়ে পরী বিবির মাজার। এখানে আছে দরবার হল, নবাবের হাস্তামখানা। আছে শাহী মসজিদ। রয়েছে একটি জাদুঘরও। সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত খোলা থাকে এটি।

বুড়িগঙ্গা ইকোপার্ক

শান বাঁধানো নদীর ঘাটে নৌকা বাঁধা দেখতে যেতে হবে বুড়িগঙ্গা ইকোপার্ক। মুদ্মন্দ হাওয়া থেকে চাইলে এখানে নৌকায় করে ঘূরতে পারেন। জায়গাটি গাছগাছালিতে ঢাকা। গাছের ফাঁকে পাকা রাস্তা। শহরের কোলাহল ছেড়ে রাজধানীর উপকর্তৃ শ্যামপুরে প্রায় সাত একর জায়গার ওপর গড়ে উঠেছে পার্কটি।

ওয়াক্রার পার্ক

ওয়াক্রার পার্ক ঢাকার সায়েদাবাদ রেলক্রসিংয়ের পাশে অবস্থিত। খোলা থাকে সকাল ১০টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত। এখানে রাইডের মধ্যে রয়েছে ফ্লাওয়ার কাপ, মিনি ক্যাব, বেবি কার, টয় ট্রেন, ভয়েজার বোর্ড, টুইস্টার, এতিহ্য ও রংপুরী জামদানি পল্লীর কারকাজ। ◆

সুপার চেয়ার, মেরি-গো-রাউন্ড, ওয়াক্রারল্যান্ড ইত্যাদি।

ঢাকার আশপাশ থেকেও ঘুরে আসা যায়। নন্দন পার্ক, ফ্যাটাসি কিংডম, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারি পার্ক। গাজীপুরে আছে অনেক রিসোর্ট। নারায়ণগঞ্জের পানাম নগরী, হাজীগঞ্জ জলদুর্গ, সোনারগাঁওয়ে লোক ও কারুশিল্প জাদুঘর এবং বাংলার তাজমহল। মানিকগঞ্জের বালিয়াটি জমিদারবাড়ি থেকেও ঘুরে আসা যায়।

ঢাকা ডিনার ক্রজ

রাজধানী ঢাকার নগর বিনোদনে অনন্য সংযোজন ঢাকা ডিনার ক্রজ। শহরের কোলাহল পেরিয়ে ঈদের ছুটিতে উপভোগ করতে পারেন শীতলক্ষ্য নদী ভ্রমণ। শহর থেকে মাত্র ২০ মিনিটের দূরত্বে খিলক্ষেত ৩০০ ফিট রাস্তা ধরে কাঞ্চন বিজসংলগ্ন পূর্বাচল রাজাউক অফিস ঘাট থেকে শীতলক্ষ্যয়া যাত্রা শুরু করে ঢাকা ডিনার ক্রজের ভ্রমণতরী। শীতলক্ষ্যয়া সন্ধ্যাকালীন এই নৌভ্রমণ ব্যস্তিজীবনে পাবেন প্রকৃতির নির্মল আনন্দ। পরিচ্ছন্ন পর্যটন জাহাজে নৌভ্রমণ, বার-বি-কিউ ডিনার ও উষ্ণ আতিথি আপনি নিশ্চিত মুঝ হবেন। শীতলক্ষ্য নদীর সাথে মিশে আছে বাঙালির ইতিহাস ঐতিহ্য। বিখ্যাত মসজিদ শিল্প শীতলক্ষ্য নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে গড়ে উঠেছিল। যেতে যেতে উপভোগ করতে পারবেন মুঢ়াপাড়া জমিদার বাড়ির ঐতিহ্য ও রংপুরী জামদানি পল্লীর কারকাজ। ◆



ঘুরে আসতে পারেন বালিয়াটি প্রাসাদ

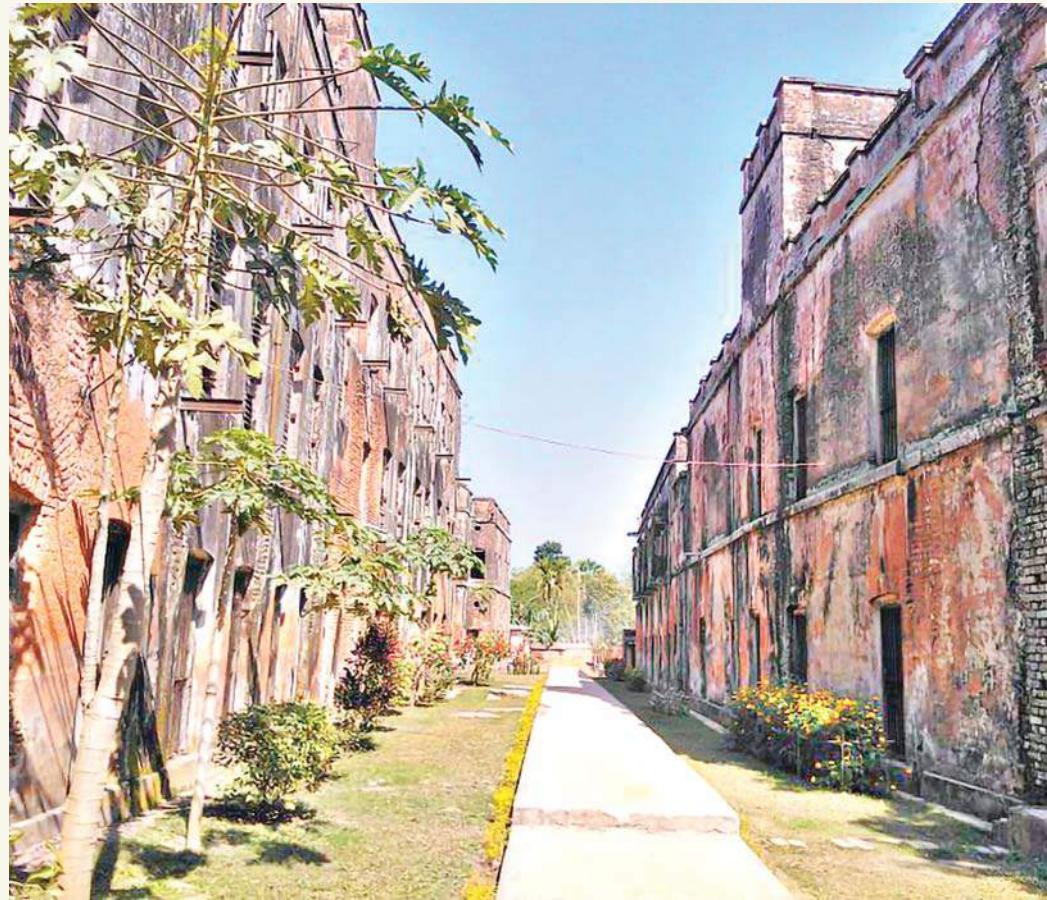
■ পর্যটন বিচিত্রা ডেক্স

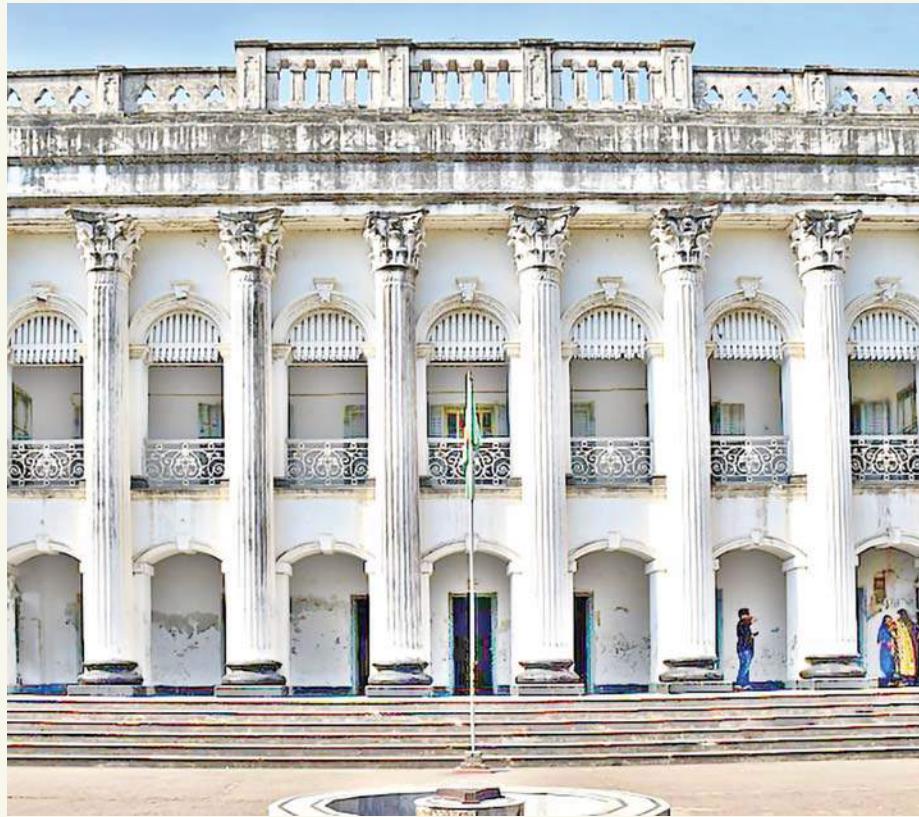
এবারের দৈদের ছাটিতে ঘুরে আসতে পারেন উনিশ
শতকের অপূর্ব নির্দর্শন-মানিকগঞ্জের বালিয়াটি
প্রাসাদ। রাজধানীর কাছাকাছি যে কয়টি দশনীয় স্থান
রয়েছে, তাদের মধ্যে এটি অন্যতম। বাংলাদেশে
প্রিস্টীয় উনিশ শতকের একটি অপূর্ব নির্দর্শন এটি।
স্থানীয়দের কাছে যা বালিয়াটি জমিদারবাড়ি নামেও
পরিচিত।

বালিয়াটি গ্রামের জমিদার গোবিন্দ রাম সাহা ছিলেন
এর প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ছিলেন আঠার শতকের

মাঝামাঝি সময়ের একজন বড় মাপের লোক
ব্যবসায়ী। দুর্ধি রাম, পতিতি রাম, আনন্দ রাম এবং
গোলাপ রাম-এই চার ছেলেকে রেখে তিনি প্রয়াত
হন। সন্তুষ্ট তাদের দ্বারাই পরবর্তীতে বিভিন্ন সময়ে
এই বালিয়াটি প্রাসাদটি নির্মিত হয়।

৫ দশমিক ৮৮ একর জমির ওপর প্রতিষ্ঠিত এই
প্রাসাদের অভ্যন্তরে রয়েছে দুই শতাধিক কক্ষবিশিষ্ট
সাতটি ভবন। সামনের চারটি ভবন ব্যবহৃত হতো
ব্যবসায়িক কাজে। প্রাসাদের পেছনেই রয়েছে
অন্দরমহল, যেখানে বসবাস করতেন জমিদার
পরিবারের সদস্যরা। অন্দরমহলের পেছনে রয়েছে
হয় ঘাটলার পুকুর। অন্দরমহলের ভেতরে-বাইরে
ছোট-বড় মিলিয়ে নয়টি কুপ। সুপেয় পানির জন্য





এসব কৃপ ব্যবহার করতেন তারা।

পুরো প্রাসাদটির চারদিকে রয়েছে সুউচ্চ সীমানা প্রাচীর।

বাড়ির সামনে, দক্ষিণ দিকের প্রাচীরে রয়েছে পশাপাশি একই ধরনের তিনটি তোড়ণ। প্রতিটির উপর রয়েছে একটি করে সিংহ। তোরণ পার হয়ে

ভেতরে ঢুকতেই চোখে পড়বে কারুকার্যময় চারটি প্রাসাদ।

বালিয়াটি প্রাসাদটি বর্তমানে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন প্রততত্ত্ব অধিদপ্তরের আওতায় ১৯৬৮ সালের এন্টিকুইটি অ্যাস্ট্রের ১৪ নং ধারা (১৯৭৬ সালে সংশোধিত) এর আওতায় সুরক্ষিত ও

সংরক্ষিত হচ্ছে। পশ্চিম দিক থেকে দ্বিতীয় স্থাপনাটির দ্বিতীয় প্রাচীর দিক থেকে দ্বিতীয় জাদুঘর হিসেবে।

এই জাদুঘরের নিচতলায় রয়েছে ১৫টি লোহার সিন্দুক। এসব সিন্দুক মূল্যবান দ্রব্য রাখার কাজে ব্যবহার করতেন জমিদারেরা।

কাঠের সিঁড়ি বেয়ে জাদুঘরের দ্বিতীয় তলায় উঠলেই কারুকার্যমণ্ডিত রংমহল। বিশাল হলুরমসহ ওই রংমহলের সঙ্গে রয়েছে আরও পাঁচটি কক্ষ। রংমহল এবং ওই সব কক্ষে শোভা পাচ্ছে জমিদারদের ব্যবহৃত গ্রামোফোন বাক্স, ক্যাশ বাক্স, নামফলক, হারিকেন, হ্যাজাক বাতি, বদনা, বুন্টত প্রাদীপ, পুজুর আসন, কাঠের চিমনি, পাথরের ছাইদানি, দেয়াল আয়না, কাঠের সিন্দুক, শ্বেতপাথারের গাড়ি ও টেবিল, বাড়বাতি, শিরলিঙ্গ, কাঠের আলমারি, ফুলদানি, চেয়ার, আলনা, রাইফেল স্ট্যান্ড, কাঠের পাদস্তুত ও পালকসহ সংগৃহীত বিভিন্ন প্রাচীন নিদর্শন।

মানিকগঞ্জ জেলার সদর থেকে ২১ কিলোমিটার উত্তরে-পূর্বে এবং ঢাকার গাবতলী থেকে ৪০ কিলোমিটার পশ্চিমে অবস্থিত এই প্রাসাদটির বাইরে গাড়ি রাখার ব্যবস্থা ও বসার জায়গা আছে। আছে নিরাপত্তাপ্রাহরী। হাতের কাছেই মিলবে চা, কফি, আইসক্রিম, মিষ্টি।

রাজধানী থেকে জমিদারবাড়ি পৌছতে ঘণ্টা দুয়েক লাগে। ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের ধামরাইয়ের কালামপুর থেকে ডানে চুকে সোজা গেলে সাটুরিয়া উপজেলা সদর। উপজেলা পরিষদের পাশেই বালিয়াটি প্রাসাদ।

রোববার পূর্ণ দিবস এবং সোমবার অর্ধদিবস বাদে সপ্তাহের অন্য দিনগুলোতে সকাল নয়টা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত খোলা থাকে প্রাসাদটি। প্রবেশ মূল্য ২০ টাকা, ৫ বছরের কম বয়সীদের জন্য ৫ টাকা, দেশের বাইরে সার্কুলেট দেশের নাগরিকদের জন্য ১০০ টাকা এবং অন্যান্য দেশের নাগরিকদের জন্য ২০০ টাকা নির্ধারিত। ◆

পর্যটন করপোরেশনের নতুন চেয়ারম্যান রাহাত আনোয়ার

■ পর্যটন বিচিত্র প্রতিবেদন

বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের নতুন চেয়ারম্যান হয়েছেন মো. রাহাত আনোয়ার। ৪ এপ্রিল জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের জরি করা এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন থেকে এ তথ্য জানা যায়।

আদেশে বাংলাদেশ জুটি মিলস করপোরেশনের চেয়ারম্যান হো. রাহাত আনোয়ারকে গ্রেড-১ পদোন্নতি দিয়ে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের চেয়ারম্যান পদে বদলি করা হয়েছে। বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের বর্তমান চেয়ারম্যান আলী কদরকে অবসরে যাওয়ার সুবিধার্থে ওএসডি করা হয়েছে। মো. রাহাত আনোয়ার বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (বিসিএস) ১৩ ব্যাচের প্রশাসন ক্যাডারের সদস্য। তিনি

২০২২ সালের ১৮ ডিসেম্বর বাংলাদেশ জুটি মিলস করপোরেশনের (বিজেএমসি) চেয়ারম্যান হিসেবে যোগদান করেন। বিজেএমসিতে যোগদানের পূর্বে তিনি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে অতিরিক্ত সচিব ও যুগ্ম সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এর আগে তিনি বাংলাদেশ টেলিভিশনের পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া তিনি জেলা প্রশাসক হিসাবে রংপুর ও সিলেট জেলায় দায়িত্ব পালন করেন। পেশাগত প্রশিক্ষণ কাজে তিনি ভারত, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম, যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, স্পেন, ইতালি, সুইজারল্যান্ড সফর করেছেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্যে ম্লাতক ও ম্লাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ◆



Explore Tanguar Haor

A unique Wetland and Ramsar site in Bangladesh

বিহাঙ্গ বিলাস



Stay on the luxury houseboat

Overnight Cruise

2Day-1Night Cruising by

Luxury Houseboat
BIHANGO

7500 BDT/Per Person

*Stay Cabin with all meals

*Twin Share basis

*Sunamganj to Sunamganj

Facilities

Couple Bedded Cabin
Attached Bathroom
Wooden House Boat
Furnished Lounge
Eco Friendly Boat
Open Roof
All meals
Guided trip

Visiting Spots

Tanguar Haor
Kharchar Haor
Watch Tower
Niladri Lake
Jadukata River
Barikka Tila
Shimul Garden
and many more attractions

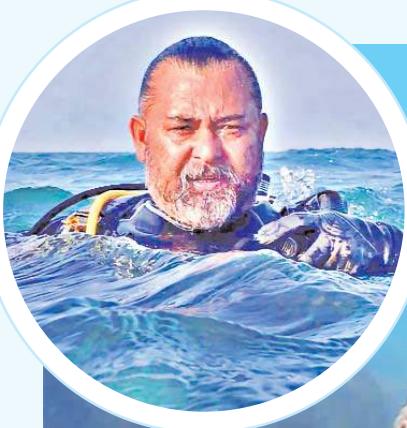


go river-go green
www.riverandgreen.com

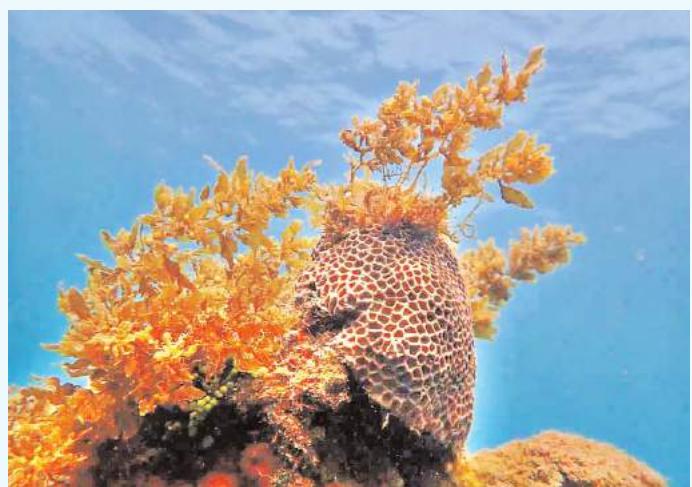
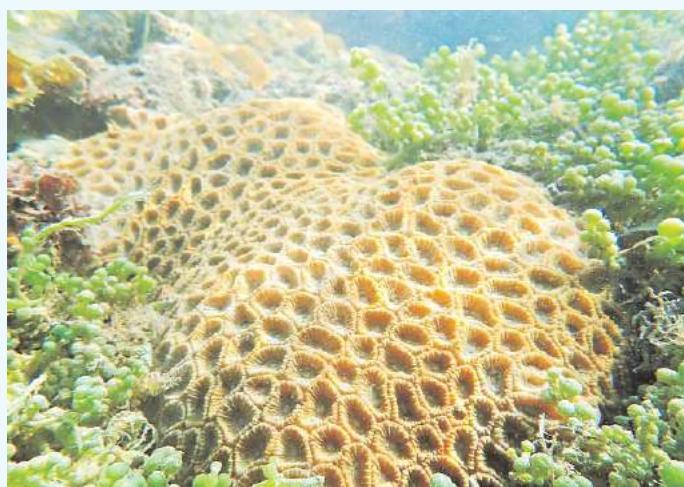
Contact for Reservation

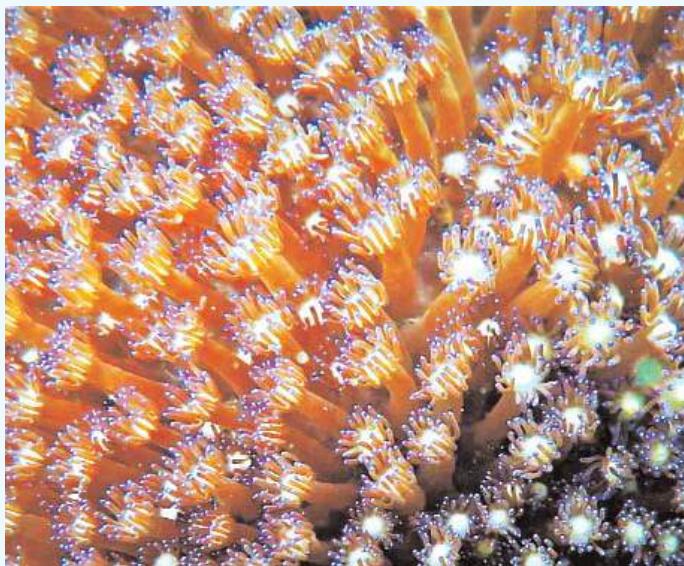
+880 1979 224 593
+880 1708 427 790
+880 1970 004 447

বঙ্গোপসাগরে ডুবে ডুবে ছবি তোলেন শরীফ সারওয়ার



বঙ্গোপসাগরে গভীরে ডুবে ডুবে ছবি তোলেন শরীফ সারওয়ার। সেসব ছবিতে উঠে আসে জলদুনিয়ার প্রকৃতি আর প্রাণী। সমুদ্র-গবেষকেরা তার ছবিতে খুঁজে পান অজানা অনেক তথ্য। শরীফ সারওয়ারের তোলা কিছু ছবি পর্যটন বিচিত্রার পাঠকদের জন্য এখানে দেওয়া হলো-







চেত্র-বৈশাখ মেলার আডং

ডিসেম্বর ও মেলা

■ ইমরান উজ-জামান

পিঞ্জুর ছেড়ে সোনার পাথি একদিন উড়িয়া যাইবে
গহীনও কাননে একদিন জন্মের মতো লুকাইবে।
ফিরবে যেদিন হয়াতের ডুরী
আমার শুয়া পাখিটা সেদিন যাইবো উড়িরে
ডাকলে আর চাইবো না ফিরি তার ভাবে সে
চলিবে।।

সাঙ্গ হবে ভব তামাশা
দুনিয়ার সব ভালোবাসারে
সেদিন বাট্টল কবি মজনু পাশা চির নিদ্রায়
ধূমাইবে।।
পাথি উড়িয়া যাইবে”

মাইকে চলছে বাট্টল মজনু পাশার গান। গানের সাথে ভারতের মেঘালয় রাজ্যের সারি সারি উঁচু-নিচু খাসিয়া পাহাড় এবং বাংলাদেশের বারেক টিলাৱ সবুজ বনায়ন ও মাটিয়া পাহাড় চিঞ্চিৎক ও মনোহ-
ারি। লাউডের গড়ের কাছেই পুণ্যতীর্থ ধাম সংলগ্ন যাদুকাটা নদী। ওপাড়ে শাহ আরেকিনের কবর আর এই পাড়ে শাহ আরেকিনের বাসা এবং ইবাদতের স্থানে গড়ে ওঠা মসজিদ। কাজেই দুই পার্শ্বই ভঙ্গদের জন্য পবিত্র। চলছে শাহ আরেকিনের মেলা। একে মেলা না বলে মেলার আডং বলা যায়। এক পাশে বসে পেসরা-সামগ্ৰীৰ বিকিকিনি। অন্য

পাশে পীর ফকিরের মজলিশ ও গীত-কংগে মম
করে। সাথে গৰ, থাসি, মুৰগি জবাই, রান্না-বান্না,
খাওয়া-দাওয়া চলে সমান তালে। আগের দিনে
বিডিআর-বিএসএফের সমৰোত্য ভারত-
বাংলাদেশের সীমান্ত উন্নত করে দেওয়া হতো
একদিনের জন্য। মেলা চলে ৩ দিন।

বৰ্ষীয়ানদের মুখে শোনা, এই মেলার বয়স ১০০
বছরেরও বেশি। এই দুই মেলাকে ঘিরে এখানে
দেশের দুর্দুরান্ত থেকে আসে লাখ লাখ মানুষ।
যাদুকাটা নদীতীরে লাউড, নবগ্রাম, শ্রী শ্রী আদ্বৈত
প্রভুর মন্দির ও পুণ্যতীর্থ ধাম। এছাড়া আছে
বোতাশহর মাজার, কিয়ত দূরেই আছে প্রমাণ
আকারের দুষ্টিকাড়া শিমুল বাগান। ঘন জঙ্গলের
ফাঁকে ফাঁকে দেখা যাবে আদিবাসীদের কাঁচা
ঘৰবাড়ি। নয়নাভিরাম চোখ জুড়ানো দৃশ্য দেখে
চিলার ওপর কাটিয়ে দেয়া যায় দু দণ্ডকাল।
চেত্র মাসে মধুকৃষ্ণ ত্রোদশী তিথিতে নদী তার পুণ্য
স্নোতে প্রমত্ত হয়ে উঠে। ঐতিহাসিকভাবেই সেই
তিথিতে পুণ্যস্নানের আয়োজন হয়। বাংলাদেশের
অনেক এলাকায় পুণ্যস্নানের আয়োজন হয়। কেবল
নদী নয়, এই সময়ে ময়মনসিংহের ব্রহ্মপুত্র নদ,
মৌলভীবাজারের মাধবকুণ্ড জলপ্রপাত, মাদারীপুরের
ওড়াকান্দি আশ্রমের পুকুর, শ্রীমঙ্গলের নিশ্চাই শিব
বাড়ির সংরক্ষিত পুকুরসহ নানা স্থানে হয় পুণ্যস্নান
এবং বারুনি মেলা। বারুনি স্নান বিভিন্ন জায়গায়

কথিত আছে, জনেক হিন্দু
জমিদার নারায়ণ চক্রবৰ্তী
খরাজনিত কারণে একটি পুকুর
খনন করেন। কিন্তু পুকুরে পানি না
উঠায় স্বপ্নাদেশ অনুযায়ী তার দুই
মেয়ের সিন্দুর ও মতিকে পুকুরের
মাঝাখানে নামিয়ে পূজার ব্যবস্থা
করেন। কিন্তু জমিদার পূজার
উপাচার সঠিকভাবে ব্যবস্থা করতে
না পারায় তা সংগ্রহের জন্য যান।
এই ফাঁকে পুকুর পানিতে ভরে
যায়। সকলেই পাড়ে উঠলেও
সিন্দুর ও মতি অঁথে পানিতে
তলিয়ে যায়। পরে জমিদার স্বপ্নে
দেখেন তার দুই মেয়ে দেবত্বপ্রাপ্ত
হয়ে অমরত্ব লাভ করেছে। সেই
থেকে কালক্রমে ওই স্থানের নাম
হয় সিন্দুরমতি।



বিভিন্ন সময় হয়ে থাকে। তবে সেটা অবশ্যই চৈত্র মাসে। চৈত্র মাসের বিভিন্ন তিথিতে ভাগ করে বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠী পদ্মা, মেঘনা, ব্রহ্মপুত্র, গঙ্গাসহ বিভিন্ন নদীতে শান করেন। এ উপলক্ষে সেই সমস্ত জায়গায় মেলা বসে। কাজেই মেলা সমূহকে বাক্সি-নর মেলা বলা হয়।

উত্তরাঞ্চলের কিংবদন্তি পুরুর সিন্দুরমতি। এটি শুধু একটি সুবিশাল পুরুর নয়, হাজার বছর ধরে সনাতন ধর্মাবলঞ্চাদের তৈরিক্ষেত্র। কৃতিগ্রাম জেলার রাজারহাট উপজেলার উত্তর-পশ্চিম শেষ সীমানায় প্রত্যন্ত গ্রামে সিন্দুরমতি দীর্ঘ। কথিত আছে, জনেক হিন্দু জমিদার নারায়ণ চক্রবর্তী খরাজিত কারণে একটি পুরুর খনন করেন। কিন্তু পুরুরে পানি না উঠায় স্বপ্নাদেশ অনুযায়ী তার দুই মেয়ের সিন্দুর ও মতিকে পুরুরের মাঝখানে নামিয়ে পূজার ব্যবস্থা করেন।

কিন্তু জমিদার পূজার উপচার সঠিকভাবে ব্যবস্থা করতে না পারায় তা সংগ্রহের জন্য যান। এই ফাঁকে পুরুর পানিতে ভরে যায়। সকলেই পাদে উঠলেও সিন্দুর ও মতি অঁথে পানিতে তলিয়ে যায়। পরে জমিদার স্বপ্নে দেখেন তার দুই মেয়ে দেবত্তপ্রাণ হয়ে অমরত্ব লাভ করেছে। সেই থেকে কালক্রমে ওই স্থানের নাম হয় সিন্দুরমতি।

সনাতন ধর্মাবলঞ্চার স্থানকে প্রারজনমে পুণ্যবান হওয়ার মাধ্যম বলে বিশ্বাস করে। প্রতিবছর চৈত্র মাসের নবমী তিথিতে পুরুরটিতে হিন্দু সম্প্রদায়ের নারী-পুরুষ পূজা আর্চনা করে থাকে এবং বিরাট মেলা হয়।

সীতাকুণ্ডের দর্শনীয় এবং মনোহর জায়গা চন্দনাথ পাহাড়। এখানে পাহাড়ের ছড়ায় আছে শিবমন্দির, যা হিন্দু ধর্মাবলঞ্চাদের কাছে মহা পূজ্যবীয়। জনশ্রুতি আছে, নেপালের এক রাজা স্বপ্নে পথিকীর পাঁচ স্থানে শিবমন্দির স্থাপনের আদেশ পান। সেই মতে রাজা নেপালের পশ্চিমতাথ, কাশিতে বিশ্বানাথ,



পাকিস্তানে ভুতনাথ, মহেশখালীর আদিনাথ এবং সীতাকুণ্ডের চন্দনাথ মন্দির নির্মাণ করেন। প্রাচীন আমলে এখানে মহামুনি ভার্গব বাস করতেন, অযোধ্যার রাজা দশরথের পুত্র রামচন্দ্র তার বনবাসের সময় এই স্থানে এসেছিলেন। মহামুণি ভার্গব রাজা দশরথের পুত্র রামচন্দ্র আগমন করবেন জেনে তাদের গোসলের জন্য তিনটি কুণ্ড সৃষ্টি করেন। রামচন্দ্রের সাথে তার স্ত্রী সীতাও এখানে এসেছিলেন। রামচন্দ্রের স্ত্রী সীতা এই কুণ্ডে গোসল করেছিলেন এবং সেই থেকে নাম হয়ে যায় সীতাকুণ্ড। সীতাকুণ্ড চন্দনাথ পাহাড়সংলগ্ন বসবাসকারী হিন্দু ধর্মাবলঞ্চার প্রতিবছর ফাল্গুন মাসের শিববর্ত্তদীনতে আয়োজন করে শিবর্ত্তদীন

মেলা। বাংলাদেশসহ পথিকীর বিভিন্ন দেশ থেকে অসংখ্য সাধু এবং নারী-পুরুষ যোগদান করেন মেলায়। লেংটা বাবা সোলেমান শাহ একটা লাল গামছা ছাড়া জীবনে দেহে কোনো কাপড় পরেননি। যার কারণে তাকে লেংটা বাবা বলেন ভক্তকুল। ভক্তরা নিজেরাও লাল গামছা গলায় পড়েন, কেউ কেউ পরনের বসনও লাল গামছা ধারণ করেন। চৈত্র মাসের সতেরো তারিখে সোলেমান শাহর জন্মদিন উপলক্ষে তার জন্মস্থান বেলতলিতে মেলা বসে। দেশের সারাদেশ থেকে ভক্তকুল এসে আসন পাতেন; চলে মেলা-ভজন-গাজন আর গান। হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান চলে, ‘আইছি লেংটা,

যামু লেংটা, মাঝখানে ক্যান গঙ্গগোল...!' নাচের তালে তালে 'দোহাই বাবা, লেংটা বাবা...!' দিনাজপুরের বিরামপুরে ভৈরবের রাজা প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্যপূর্ণ চৈত্র সংক্রান্তির মেলা। বিরামপুরের মিজানপুরে রাজা ভৈরবের চন্দ্রের জামলেশ্বর কাচারি বাড়িতে বসে মেলা। প্রজাদের খাজনা আদায়ে প্রজাদের শাস্তি দিতে ৫০ ফুট উচু টিলার ওপর ১১১ সনে শিব মন্দির নির্মাণ শেষে চৈত্র সংক্রান্তির দিনে পূজার প্রচলন করেন। প্রজাদের আগমনে পূজার দিন মেলায় রূপান্তরিত হয়, গরে মেলার স্থায়িত্ব হয় সঙ্গথ্যাপী।

চৈত্রের তৃতীয় সপ্তাহ থেকে অর্ধাং সাতদিন আগে থেকে শুরু হয় নীল পূজার পার্বণ। নীলপূজা বা নীলঘষ্টী সনাতন বস্তীয় লোকোৎসব। নীল-নীলাবতী নামে শিব-দুর্গার বিবাহ উৎসব এটি। যেরস্ব গৃহিণীরা সপ্তাহের মঙ্গল কামনায় নীরোগ সুস্থ জীবন কামনা করে নীলঘষ্টী ব্রত পালন করে। নানা আয়োজনে অতিবাহিত হয়ে চৈত্র সংক্রান্তির দিন সকা঳ ভাইয়ের বোনের বাড়ি যায়, ছাতু খায়।

'শক্রের মুখে দিয়া ছাই'

ছাতু উড়াইয়া ঘরে যাই ।' চৈত্রের শেষ দিনে বাংলার নিজস্ব উৎসব ভাই ছাতু। এরপর লাল কাপড় অথবা পাগড়ি বাঁধা মাথায়, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, হাতে ত্রিশূল, সঙ্গে ঢাক-ঢোল, করতাল ও কাসর বাদ্য বাহারি সাজে শিব-পার্বতী ও হনু (গাগল সাধু) নীলকে সঙ্গে নিয়ে বাড়িতে বাড়িতে ছুটিবে দলপতি বালা। হিন্দু বাড়ির উঠানে আল্লানা দিয়ে কেউ বা উঠান লেপন করে তাতে বসায় নীলকে। এরপর শুরু নীল নাচ ও শিবের গাজন।

মেলার ইতিহাসে বৈশাখী মেলার আছে বিশেষ স্থান। বাংলা সনে বৈশাখ মাস হিসেবে যুক্ত হওয়ার আগে থেকেই, শস্য তোলার মাস হিসেবে এই সময়ে মেলা-পার্বণ উদযাপিত হতো। তার মানে ১৫৫৬ সালে মুঘল সম্রাট জালালউদ্দিন মোহাম্মদ আকবর তার সভাসদ জ্যোতির্বিদ আমির ফতুল্লাহ শিরাজির সহযোগিতায় যে বাংলা সন প্রবর্তন করেন, তার আগে থেকেই মেলা প্রচলিত ছিল তো বটেই। মেলার প্রচলন ধরে নেয়া হয় আরও প্রাচীন থেকে প্রাচীন সময়ে।

দুপুরের পর শুরু হয় গাছ ধূঢ়ানি বা চড়ক পূজা। বরিশাল, সাতক্ষীরা, দিনাজপুর, কালিয়াকৈর উল্লেখ করার মতো চড়ক হয়। বৈশাখের প্রথম দিন হয় হালখাতা, কোথাও কোথাও বৈশাখের দ্বিতীয়-তৃতীয় দিনও হালখাতা হয়। বৈশাবি ও পাঁচন উৎসব এবং বৈশাবি হয় পার্বত্য এলাকায়। মেলার ইতিহাসে বৈশাখী মেলার আছে বিশেষ স্থান। বাংলা সনে বৈশাখ মাস হিসেবে যুক্ত হওয়ার আগে থেকেই, শস্য তোলার মাস হিসেবে এই সময়ে মেলা-পার্বণ উদযাপিত হতো। তার মানে ১৫৫৬ সালে মুঘল সম্রাট জালালউদ্দিন মোহাম্মদ আকবর তার সভাসদ জ্যোতির্বিদ আমির ফতুল্লাহ শিরাজির সহযোগিতায় যে বাংলা সন প্রবর্তন করেন, তার আগে থেকেই মেলা প্রচলিত ছিল তো বটেই।

মেলার প্রচলন ধরে নেয়া হয় আরও প্রাচীন থেকে প্রাচীন সময়ে।

বৈশাখ আমের শাখের মাস, বৈশাখ স্নান কৃত্যের মাস, বৈশাখ ব্রতচারের মাস, বৈশাখ মধু মাস, বৈশাখ মেলা-পার্বণের মাস। ব্রত পার্বণের কথাই যদি ধরা হয়, এই মাসে পালিত হয় পুণ্যপুকুর ব্রত, অশ্ব পাতার ব্রত, গোকুল ব্রত, হরিষ মঙ্গল ব্রত, পথিদ্বী পার্বণের ব্রত, দশপুতুল ব্রত, শিবপূজা ব্রত, জল-সংক্রান্তি ব্রত, অক্ষয় তৃতীয়া ব্রত, বৈশাখ চম্পক ব্রতসহ আছে অনেক ব্রত।

বাংলা একাডেমির থেকে প্রকাশিত 'ধানশালিকের দেশ' ২৫ বর্ষ ধূয় সংখ্যা এপ্রিল-জুন ১৯৯৭ এর মেলা সংখ্যা'র তথ্য মতে, বাংলাদেশে বৈশাখ মাসে

আয়োজিত মেলার সংখ্যা ২৪৫। বাংলাদেশ শুন্দি ও কুঠির শিল্প কর্পোরেশন 'মেলা' সংখ্যা ১৯৮১ সালের করা ২য় সংক্রণ বইতে বৈশাখ মাসের মেলা ২৭০। বাংলা নববর্ষ, বর্ষবরণ, নববর্ষ, বৈশাখী মেলা, হালখাতা মেলা যে নামেই

বলা হোক না কেন, এসবই বৈশাখী মেলা হিসেবে আয়োজিত হয়।

এছাড়া চৈত্রের শেষ দিন সংক্রান্তি উপলক্ষে বসা মেলা সমূহ যেহেতু বৈশাখ পর্যন্ত চলে, কাজেই সংক্রান্তি এবং চড়ক পূজার মেলাকেও বৈশাখের মেলা হিসেবেই যুক্ত করতে হবে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ শুন্দি ও কুঠির শিল্প কর্পোরেশনের হিসাবে চৈত্রে মেলার সংখ্যা ৩৩৭টি। এছাড়া মহানামবৃত, বৌদ্ধ পুণ্যমা, শাহ কামাল (র.) এর ওরশ রত্নকর গোস্মামী উৎসব, হযবরত খাজা আব্দুল গফুর চিশতীর ওরস, আশ্বিনী গোস্মামী উৎসব, কালার মাজার ওরশ, রবীন্দ্র জয়ন্তা, শীতলা পার্বণ, জিওর উৎসব, আশ্রম উৎসব, বুড়ি পার্বণ, বিপন চন্দ্ৰ ঠাকুৰ উৎসবসহ আরও কিছু লোক মেলা এই বৈশাখে আয়োজিত হয়। ধারণা করা যায়, শুধু বৈশাখ মাসেই

বাংলাদেশে প্রায় হাজারের অধিক মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

লেখক: সাংবাদিক ও পরিব্রাজক ◆





বরগুনায় রাখাইনদের জলকেলি উৎসব

ঞ্জিনো

■ আরিফুর রহমান, বরগুনা থেকে
পুরোনো বছরের প্লানি মুছে নতুনকে বরণ করতে
বরগুনার তালতলী উপজেলার রাখাইনপাড়ায় হয়ে
গেল জলকেলি উৎসব। রাখাইন বর্ষ ১৩৮৪-কে
বিদায় জানিয়ে নতুন বছর ১৩৮৫ বরণ করতে
তাদের এই উৎসব। যেটিকে রাখাইন ভাষায় বলে
'সাংগ্রাই'। ১৭ এপ্রিল শুরু হওয়া এই জলকেলি
উৎসব চলে ১৯ এপ্রিল পর্যন্ত।

জলকেলি উৎসব ঘিরে রাখাইন পদ্মীগুলোতে চলে
নানা আয়োজন। উৎসবে রাখাইন সম্প্রদায়ের
সদস্যরা একে অপরকে পানি ছিটিয়ে পরিশুম্ব করে
নতুন বছরকে বরণ করে নেন। রাখাইন সাংস্কৃতিক
অনুষ্ঠান আর নাচে-গানে মেটে উঠেন তরুণ
তরুণীরা।

রাখাইন সম্প্রদায়ের এই আয়োজন উপভোগ করতে
ভিড় করেন অন্য সম্প্রদায়ের লোকজন ও বরগুনা
ভ্রমণে আসা পর্যটকরা। এর মধ্য দিয়ে এই
আয়োজন রূপ নেয় সর্বজীবী উৎসবে।

রাখাইন তরুণী তেমং ওয়েন বলেন, ইংরেজি ও
বাংলা নতুন বর্ষকে যোভাবে বরণ করা হয় ঠিক
তেমনভাবে রাখাইন বর্ষকে আমরা বরণ করে নিই।
এই অনুষ্ঠানে রাখাইন তরুণ-তরুণীরা একে অপরকে
পানি ছিটিয়ে পুরোনো বছরের ব্যর্থতা ও অপূর্ণতাকে
ধূয়ে মুছে নব উদ্যমে শুরু করি নতুন বছর।



জলকেলি উৎসব আয়োজন কমিটির সভাপতি
রাখাইন নেতৃ তেও মং থে বলেন, প্রতিবছরের মতো
এবারও আমরা বর্ণাদ্য আয়োজনে জলকেলি
উৎসবের আয়োজন করি। এই উৎসবে রাখাইন
সম্প্রদায়ের লোকজন ছাড়াও স্থানীয়রা যোগ দিয়ে
এই অনুষ্ঠানটিকে আরও উজীবিত করেছেন।
তিনি আরও বলেন, উৎসব আয়োজনে উপজেলা
প্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন ও স্থানীয় রাজনৈতিক
ব্যক্তিরা সার্বিক সহযোগিতা করেছেন। ◆

বরগুনা জেলা পর্যটন উদ্যোগী আরিফুর রহমান
বলেন, এই উৎসবকে কেন্দ্র করে বরগুনা পর্যটন
শিল্পকে বিকশিত করার জন্য অনেক পর্যটক এই
অনুষ্ঠান উপভোগ করতে আসেন।
তালতলী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কাজী
সাখাওয়াত হোসেন তপু পর্যটন বিচিত্রাকে বলেন,
রাখাইন সম্প্রদায়ের তিনদিনের এই অনুষ্ঠানে যে
কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা প্রতিরোধের জন্য পুলিশ
কঠোর অবস্থানে ছিল। ◆



বাংলা নববর্ষে ঈদ, ঈদপর্বে নববর্ষ

উৎসব
ও জোড়া

■ মো. জিয়াউল হক হাওলাদার
প্রথ্যাত কবি T.S. Eliot Zuvi 'The Waste Land' কবিতায় এপ্রিল মাসকে সবচেয়ে নিষ্ঠুর মাস হিসেবে আখ্যায়িত করলেও উৎসবমুখর বাঙালি জাতির জন্য এই মাসটি হচ্ছে দ্বিগুণ আনন্দের। এপ্রিল হচ্ছে বাঙালিদের ধ্বনির পুরো কান্সস, টিএসসি এবং ইলিয়টের কবিতার উর্ধ্বের পোড়ো জমির বিপরীতে আমাদের দেশ এপ্রিলে হয়ে উঠে সবুজ ও সতজে। কোকিলের গানে আবির্ভূত হয় নববর্ষ। এবার এপ্রিলে আমাদের জন্য একদিকে বাংলা নববর্ষ ১৪৩০ এর আগমন, অন্যদিকে হচ্ছে সুন্দুল ফিতর। মাত্র এক সপ্তাহের ব্যবধানে একই মাসে দুটি উৎসব পালিত হয় বাংলাদেশে। তারপর্বে ২৬ মার্চ পালিত হয়েছে বাংলাদেশের ১১তম স্বাধীনতা দিবস। এটিও আমাদের জন্য মহাআনন্দের।

ঈদ এবং বৈশাখীর উৎসবে সকলে মাতোয়ারা হয়েছে। ক্রেতা-বিক্রেতা, পর্যটক এবং সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান সবাই প্রস্তুতি নেন যার যার অবস্থান থেকে। এবার পর্যটন শিল্পের আয় সকল মানদণ্ডে উপরের দিকে থাকছে। কোভিড পরবর্তী সময়ে এই দুটি দিবসে বাংলাদেশের পর্যটন শিল্প সবচেয়ে বেশি আয় করতে পারবে। অন্যদিকে ১২ এপ্রিল হচ্ছে বৈসাবি উৎসব। বাংলাদেশের পার্বত্য চৃত্গামের তিন আদিবাসী জনগোষ্ঠী চাকমা, ত্রিপুরা এবং মারমা মানুষেরা নতুন বছরকে বরণ করে নেওয়ার যে উৎসব পালন করে তাই হচ্ছে বৈসাবি। এই উৎসবকে ত্রিপুরা জনগোষ্ঠী বলে বৈসু, মারমা বলে সংগ্রাই এবং চাকমা বিজু। এই তিনটি উৎসবকে একত্রে বিজু বলা হয়। এই উৎসব কেন্দ্র করে পাহাড়ে পাহাড়ে আনন্দের রঙ লাগে, আর গানে গানে অনুরূপ হতে থাকে এক পাহাড় থেকে অন্য পাহাড়ে। ছড়াগুলো সজ্জিত হয়ে যায় ভাসমান ফুলে ফুলে। বাংলা নববর্ষকে আনন্দ-উৎসবে বরণ করতে বের

করা হয় মঙ্গল শোভাযাত্রা। সকল ধর্ম-বর্ণ-শেণি-পেশার মানবের সক্রিয় অংশগ্রহণে মঙ্গল শোভাযাত্রা শহরের বিভিন্ন রাস্তায় প্রদর্শন করা হয় বর্ণিল মাস্ক এবং ফেস্টন প্রদর্শনের মধ্য দিয়ে। রমনা বটমূল, চারকুকলা প্রাসাদ, জাদুঘর থেকে শুরু করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরো কান্সস, টিএসসি এবং শাহবাগ চতুর হচ্ছে এই আয়োজনের মূল কেন্দ্রবিন্দু। মঙ্গল শোভাযাত্রা এবং বর্ষবরণ আমাদের একটি সর্বজনীন উৎসব। এটি একদিনের উৎসব হলেও এর বেশ থেকে যায় মাসব্যাপী। বিশেষ করে হালখাতা খোলার উৎসবসহ মাসব্যাপী বৈশাখী মেলা, বিভিন্ন ধরনের খেলাধূলার আয়োজন চলতে থাকে। এই উৎসব হচ্ছে বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পের একটি অন্যতম অনুষঙ্গ।

রোজা থাকা সন্ত্রেণ পহেলা বৈশাখে রমনা বটমূলে লাখ লাখ লোকের সমাগম হবে। বৈশাখী কেনাকাটা ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে। পাশাপাশি চলছে ঈদের কেনাকাটা। একদিকে দেশের পর্যটন অর্থনীতির চাকা যেমন সচল হচ্ছে অন্যদিকে দেশের সামগ্রিক অর্থনীতির উন্নয়ন হচ্ছে। এবার পর্যটন ব্যবসায়ীরা নানা ধরনের অফার নিয়ে হাজির হচ্ছে। ভূগোলিক পাসুন্দের কাছে। হোটেল-মোটেল, রিসোর্ট, পিকনিক স্পটসহ সকল পর্যটন কেন্দ্রগুলো সাজছে উৎসবের রঙ মেখে।

বর্ষবরণে কবি গুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বর্ষবরণসহ সকল উৎসবের এবং কল্যাণের গান পরিবেশন করা হয়। আরও পরিবেশন করা হয় নজরুল ইসলামের আগন্বারা নবচেতনার সকল গান।

পুরাতন জরাজীর্ণ সকল কিছু পেছনে ফেলে দিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার শপথ হচ্ছে বাঙালি জাতির দর্শন। সকল ভেড়াভেদ, সংকীর্ণতা এবং কালিমা দূর করে এসএম সুলতানের চিত্রের মতো বলিয়ান হওয়াটাই হচ্ছে আমাদের উদ্দেশ্য। প্রযুক্তির কল্যাণে বর্ষবরণ অনুষ্ঠান লাইভে পৃথিবীর সকল

মানুষ উপভোগ করতে পারবে।

অন্যদিকে ঈদ হচ্ছে আমাদের একটি ধর্মীয় উৎসব। ঈদ মুসলমানদের অন্যতম একটি ধর্মীয় উৎসব হলেও বাংলা নববর্ষের মতো এটা সর্বজনীন রূপ লাভ করেছে। বাংলাদেশ সরকারের স্লোগান হচ্ছে-‘ধর্ম যার যার উৎসব সবার’। সকল ধর্মের নানা উৎসব বাঙালি জাতির সকল লোকের উৎসব। বাঙালির এই সম্প্রতি, মেলবন্ধনই হচ্ছে সর্বজনীন দর্শন যা বাংলাদেশের উন্নয়নের একটি অন্যতম দর্শন।

বাংলা নববর্ষ এবং ঈদ দুটি বাঙালি জাতি তথা সমগ্র বিশ্বের জন্য শান্তি, কল্যাণ এবং সৌহার্দ্য কামনা করা হয়। বাঙালি জাতির এই দর্শন সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে হবে আমাদের। পর্যটন শিল্পের মাধ্যমে এই কাজের বাস্তবায়ন সম্ভব। এজন্য বেশি বেশি বিদেশি পর্যটকদের বাংলাদেশে আমন্ত্রণ জানাতে হবে আমাদের। এই সকল উৎসবের বর্ণনা বিদেশি পর্যটকদের কাছে যথাযথভাবে তুলে ধরতে হবে। বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ মিশনগুলো এই দায়িত্ব ভালোভাবে পালন করতে পারে। বিদেশি মেহমানদের দাওয়াত দিয়ে যোলাবানা বাঙালি সংস্কৃতি তুলে ধরা প্রয়োজন। অবশ্য বিদেশে বসবাসরat বাঙালি কমিউনিটি বর্ষবরণ, ঈদ এবং পুজা-পার্বণের আয়োজন করে থাকে। এই কাজে বাংলাদেশ মিশনগুলো সহায়তা দিতে পারে।

ফুলে ফুলে আর গানে গানে মেতে উঠে বাঙালি জাতি। এই উৎসব মানে আমাদের স্বপ্নমাখা বিরাট রঙিন জীবন। সোপানে উঠার দৃষ্টি পথ চলার দৃঢ় বাসনা। ঈদ হচ্ছে সকলের মধ্যে শান্ত বন্ধন দৃঢ় করা, সমগ্র জাতির কল্যাণ কামনা। এই বছরে দুটি উৎসব এক সাথে হওয়াতে আমাদের আনন্দের সীমা নেই। দুটি উৎসবে বাঙালির প্রাণে যে উচ্চাস এবং উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছে তার আবেগ-প্রভা থেকে যায় বছরজুড়ে।

বর্ষবরণ এবং ঈদ উৎসব বাঙালির সাংস্কৃতিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এক দারুণ প্রভাব বলয় তৈরি করে। হাজার বছরের সংস্কৃতির যে বৈশিষ্ট্য তা এ সকল উৎসবে চমৎকারভাবে প্রতিভাব হয়। সকল বয়সি মানুষের যে সশ্রান্তি ঘটে বাংলা নববর্ষে তার যথেষ্ট ইতিবাচক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। সকল ক্ষেত্রেই। বাংলাদেশের সাহিত্যে এবং শিল্পে বাংলা নববর্ষের উৎসব দারুণভাবে প্রতিফলিত হয়। দেশের প্রিন্ট এবং ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াগুলো বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠান প্রচার করে যা আমাদের চেতনাকে শান্তি করে।

তরুণ প্রজন্মকে ভার্যাল জগত এবং মোবাইলফোন সংস্কৃতি থেকে বের করে এনে বাংলার পানি, মাটি, আকাশ চেনানোর জন্য সবচেয়ে উত্তম পদ্ধতি হচ্ছে বাংলা নববর্ষ এবং ঈদ উৎসব। এ সময়ে দেশের পর্যটন কেন্দ্রগুলোতে তরুণদের ঘূরতে নিয়ে যাওয়ার জন্য সবচেয়ে উত্তম পথ। আবার বাংলা নববর্ষ বরণ এবং বৈশাখী উৎসবের বিভিন্ন মেলা-পার্বণ আমাদের নতুন প্রজন্মকে বাঙালির হাজার বছরের সংস্কৃতি এবং ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে পারে। এতে বাঙালির শ্রুতিপদী গান, শিল্প এবং অন্যান্য সাংস্কৃতিক উপাদানগুলো টিকে থাকবে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে। অপরদিকে ঈদ উৎসবে বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণগুলোতে ঘূরতে গেলে নতুন প্রজন্ম যেমন দেশকে চিনবে তেমনি ব্যস্ততায় থাকায় সকল বাবা-মা মানবিক প্রশান্তি লাভ করবে। দেশের পর্যটন খাত হবে সমৃদ্ধ। আশা করা যায় এবাবের বর্ষবরণ এবং ঈদ উৎসবে বাংলাদেশের পর্যটন সেক্টরে প্রায় দড় হাজার কোটি টাকার ব্যবসা হবে। আসুন নববর্ষের উৎসবে ঈদ এবং ঈদের উৎসবে নববর্ষ উদযাপন বিদেশে না গিয়ে দেশে করি। দেশের টাকা দেশে রাখি। সর্বজনীন উৎসব কল্যাণকর হোক সকলের জন্য।

লেখক: ব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন ◆

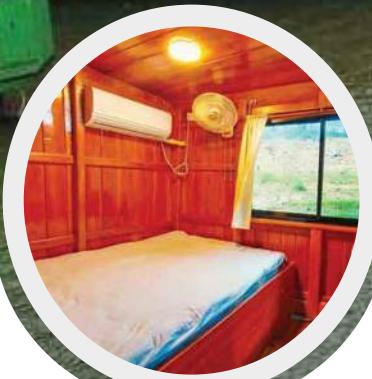


© DWM Maman

Experience Kaptai Lake

a new way to visit Rangamati

কপ্তাই
পুরনো



*Stay on the luxury houseboat & enjoy fabulous cruising on
Kaptai Lake*

Overnight Cruise

2Day-1Night Cruising by

Luxury Houseboat
SHOPNODINGI

7500 BDT/Per Person

*Stay Cabin with all meals
*Twin Share basis

Facilities

Couple Bedded Cabin
Attached Bathroom
Wooden House Boat
Rooftop Lounge
Bar-B-Q Corner
Open deck
All meals
Guided trip

Visiting Spots

Suvolong
Polwell Park
Hanging Bridge
Local Hat
Buddhist Bihar
Arranok
Kayaking on Borgi Lake



go river-go green
www.riverandgreen.com

Contact for Reservation

+880 1979 224 593
+880 1708 427 790
+880 1970 004 447

ভার্জিনিয়ার সবুজ শাল্টসভিলে ও স্থিথসোনিয়ান এয়ার অ্যান্ড স্পেস মিউজিয়াম

কল্পনা

■ এলিজা বিনতে এলাহী

মার্কিন সাহিত্য শহরখ্যাত আইওয়া থেকে যথন ভার্জিনিয়ার শাল্টসভিলে এসে পৌঁছালাম, মনে হলো রোমের কোনো পূরনো শহরে এসেছি। মনে হওয়ার কারণ, ভার্জিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য থমাস জেফারসনের নকশার কেন্দ্রবিন্দু দ্য রোড্বুক্স, যা প্যানথিয়নের অনুরূপে তৈরি করা এবং কলেজ ভবনগুলির নিও-কুসিক্যাল সমুখভাগগুলি জুনিয়াস সিজারের সময়কেই মনে করায়।

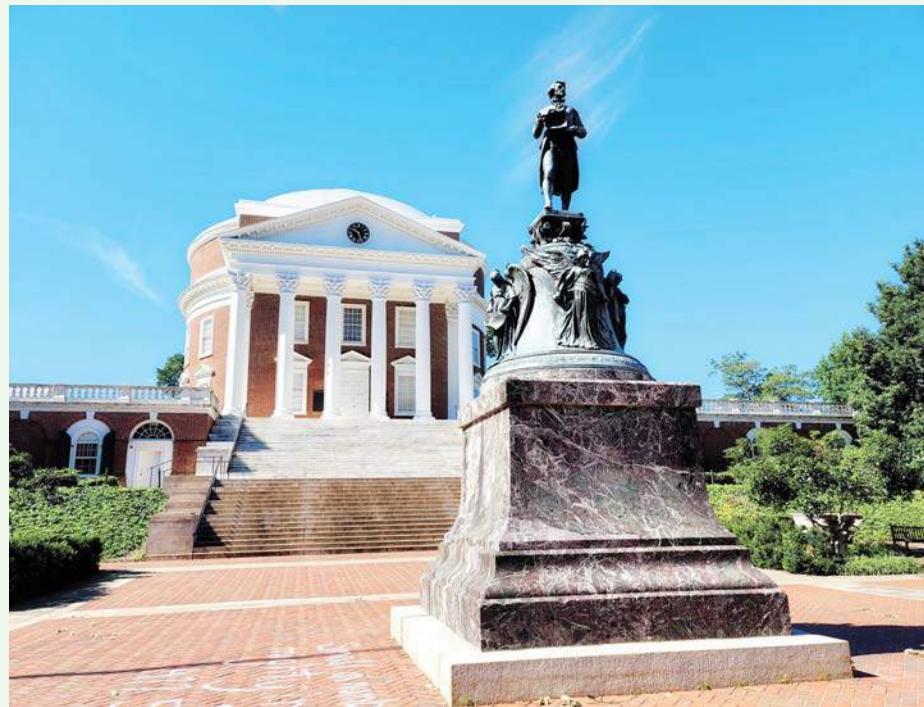
মার্কিন কমনওয়েলথ রাজ্য ভার্জিনিয়ার একটি স্থাধীন শহর শাল্টসভিলে। আমেরিকার তৃতীয় প্রেসিডেন্ট থমাস জেফারসন ও পঞ্চম প্রেসিডেন্ট জেমস মার্লের বাসভূমি শাল্টসভিলে। পুরো শহর গড়ে উঠেছে বলতে গেলে ইউনিভার্সিটি অব ভার্জিনিয়াকে ঘিরে। সাধারণ পর্যটক হিসেবে হয়েতো আমি বেছে নিতাম না এই শহর ভ্রমণের জন্য। যা ওয়ার পর বুবেছি মার্কিনিদের জ্য দারুণ গুরুত্বপূর্ণ এই শহর।

মার্কিন সরকারের আমন্ত্রণে ইন্টারন্যাশনাল লিডারশিপ প্রোগ্রাম ২০২২, সংক্ষেপে আইভিএলপি'র একজন সদস্য হিসেবে যোগ দিয়েছিলাম ২১ দিনের একটি প্রোগ্রামে। বাংলাদেশ থেকে ৫ সদস্যের একটি দলকে নিম্নোচ্চ জানানো হয়েছিল আমেরিকার ইতিহাস-ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি কীভাবে সংরক্ষণ করা হচ্ছে কিংবা বলা যায় আমেরিকার সংস্কৃতির সাথে গভীরভাবে পরিচিত হওয়ার জন্য। আইভিএলপি প্রোগ্রাম পরিচালনা করছে আমেরিকা বিশ্বব্যাপী ১৯৪০ সাল থেকে। বাংলাদেশের কার্যক্রম শুরু হয়েছে ১৯৫২ সাল থেকে। অতুল গর্বের সাথে বলতে হয়, আইভিএলপি প্রোগ্রামের প্রথম সদস্য হয়ে মার্কিন মুঠুকে পা রেখেছেন বস্ববন্ধু।

সারাদিনের আফসিয়াল মিটিংয়ের পর চেষ্টা করেছি হেঁটে হেঁটে পুরো শহর ঘৰে বেড়িয়েছি। প্রেসিডেন্ট থমাস জেফারসন ও প্রেসিডেন্ট জেমস মার্লের বাসস্থানে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ৫ সদস্যের বাংলাদেশকে দলকে। সব গল্প এই শুল্ক পরিসরে বলতে পারছি না। যেমন- দেখেছি শাল্টসভিলে শহরের টুকিটাকি, ইউনিভার্সিটি অব ভার্জিনিয়া আর স্পেস মিউজিয়াম দেখবার আনন্দ ভাগ করছি সবার সাথে এই ভ্রমণ রচনায়।

শাল্টসভিলের রেলওয়ে স্টেশন

হোটেল থেকে খুব কাছেই, বিকেলে হাঁটতে হাঁটতে গেলাম। পুরো শহরটাই উঁচু নীচু। পাহাড় কেটে বানানো। বেশ কয়েকটি সিঁড়ি ভেঙে নীচে নেমে রেলওয়ে স্টেশনে যেতে হয় ছোট্ট গোছানো ছিমছাম পরিবেশ। অল্প কিছু যাত্রী অপেক্ষারত রয়েছে। দেখে মনে হচ্ছিল আমাদেরও তো এরকম অনেক গোছানো স্টেশন ছিল। যাত্র করে রাখলে সেগুলোও এরকম লাগতো। আমাদের পাকশী, চুটগ্রাম রেলস্টেশন তো এর থেকেও সুন্দর! আমার দেশ হোক কিংবা ভিন্ন কোনো দেশের রেলওয়ে



স্পেস মিউজিয়াম পরিদর্শন
আমাদের ওয়ার্কশপ লিস্টের
অন্তর্ভুক্ত ছিল না। উপরন্ত
ওয়াশিংটন অবধি জানিটা লম্বা ছিল
বিধায় গ্রন্থের সবাই মনে মনে
একটু নিমরাজি থাকলেও কেউই
আপনি প্রকাশ করেনি। আমার
মাঝেও সেরকম কোনো ভাবান্তর
হলো না। কারণ উড়োজাহাজ
কিংবা মহাকাশগামী যান, এসব
আমি কিছু বুঝি না, আগ্রহও নেই।
তবে মহাকাশ পর্যটন শুরু হয়েছে,
যা পর্যটনের নতুন ভাবনার একটি
ক্ষেত্র এবং তা শুধুমাত্র প্রথম
বিশ্বের অঞ্চল কিছু দেশের জন্য
প্রযোজ্য।

স্টেশন হোক। একটি শুভি জমা করি রেলওয়ে
স্টেশনের। ছবি তুলবার সময় মনে মনে ভাবছিলাম,
কবে বিদেশি পর্যটকরা এসে আমাদের রেলস্টেশনের
ছবি তুলবে আমার মতো!

ইউনিভার্সিটি অব শাল্টসভিলে

প্রেসিডেন্ট হাউজগুলো, শহরের বাইরে এবং
ভার্জিনিয়া ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাস ভীষণ সবুজ।
সেদিন আমাদের কোনো অফিস মিটিং ছিল না। ফিঁ
টাইম আর কি। যে যার মতো শহর ঘৰে বেড়াতে
পারবে। আমি বেছে নিলাম ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাস।
আমার কাছে মনে হলো, জেফারসনের স্থাপত্য
প্রতিভার প্রশংসা করার সেৱা সময় হলো সকাল।
ভার্জিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয় হল কমনওয়েলথ অব

ভার্জিনিয়ার একটি সরকারি গবেষণা বিশ্ববিদ্যালয়।
এটি শুধুমাত্র ভার্জিনিয়া নামেও পরিচিত। ১৮১৯
সালে টমাস জেফারসনের ঘোষণা অনুসারে
বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়। ইউনিভে ১৯৮৭
সালে ভার্জিনিয়াকে আমেরিকার প্রথম কলেজিয়েট
বিশ্ব এতিহাসাহী স্থানের স্থীকৃতি প্রদান করে।

এই বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল গভর্নিং বিডিতে ছিলেন
জেফারসন, জেমস ম্যাডিসন ও জেমস মনরো। এই
বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠার সময় মনরো যুক্তরাষ্ট্রের
রাষ্ট্রপতি ছিলেন। পূর্বত রাষ্ট্রপতি জেফারসন ও
ম্যাডিসন ছিলেন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম দুই
রেক্টর এবং জেফারসন নিজে অধ্যয়নের মূল পাঠক্রম
নকশা করেন।

সকালের সময়টাতে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের মধ্য

দিয়ে হাঁটলে, আপনি এটি প্রায় নির্জন দেখতে
পাবেন। ১৫/২০ মিনিট পর একজন দুজন মানুষের
আনাগোন টের পাওয়া যায়। সময়টা ছিল

বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রীষ্মকালিন বিরতি, তাই
কাকপক্ষীরও দেখা পাওয়া যাচ্ছিল না। সেই বিশাল
ক্যাম্পাসে কেবল আমি, উন্দি আর দ্রুপদী
স্থাপনাগুলোই রয়েছি শুধু।

এই সময়, আপনি প্রধান লনে একা বসে থাকতে
পারেন এবং জাতিসংঘের ওয়ার্ক হেরিটেজ সাইট
রোটুন্ডার নিখুঁত প্রতিসাম্য দেখে আবাক হতে
পারেন।

মহাকাশগামী যান ‘Discovery’

প্রায় ফুরিয়ে এসেছে আমেরিকার ইন্টারন্যাশনাল
লিডারশিপ প্রোগ্রাম-২০২২। শেষ ভিজিটিং শহর
ছিল ভার্জিনিয়ার শাল্টসভিলে। সেখানে বিদ্য়
জানাতে সশরীরে উপস্থিত হলেন আমেরিকার স্টেট
ডিপার্টমেন্টের পক্ষ থেকে আইভিএলপি'র প্রোগ্রাম
ম্যানেজার কার্নেস।

শাল্টসভিলে থেকে আমরা রওনা হয়ে ওয়াশিংটন
এয়ারপোর্টে যাবো। বিদ্যারবেলোয় কার্নেস বললেন
'তোমাদের অবশ্যই ন্যাশনাল এয়ার অ্যান্ড স্পেস
মিউজিয়ামটি দেখা উচিত। 'When you are in
Virginia, it is a must see destination'।

স্পেস মিউজিয়াম পরিদর্শন আমাদের ওয়ার্কশপ



লিস্টের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।
উপরন্ত ওয়াশিংটন অবধি
জার্নিটা লম্ব ছিল বিধায়
গ্রহণের সবাই মনে মনে
একটু নিমরাজি
থাকলেও কেউই
আপত্তি প্রকাশ
করেনি। আমার
মাঝেও সেরকম
কোনো ভাবান্তর হলো
না। কারণ
উড়োজাহাজ কিংবা
মহাকাশগামী যান,
এসব আমি কিছু বুঝি
না, অগ্রহও নেই। তবে
মহাকাশ পর্যটন শুরু
হয়েছে, যা পর্যটনের নতুন
ভাবনার একটি ফেত্তে এবং তা
শুধুমাত্র প্রথম বিশ্বের অঞ্চল কিছু
দেশের জন্য প্রযোজ্য।

মহাকাশ নিয়ে পরিবারে আগ্রহ
আছে কেবল আমার ছোট ভাই
ইমনেল। ওর কাছেই অঞ্চল বিস্তর শুনি
যখন পারিবারিক আঙ্গীয়া বসি। সত্যি কথা
বলতে, স্পেস মিউজিয়াম নিয়ে গুগল করার পরও
সেরকম আগ্রহ বোধ করিন। কারণ ২১ দিনের
পরিভ্রমণে বেশ কয়েকটি মিউজিয়াম খুব গভীরভাবে
দেখেছি ও জেনেছি কাজের অংশ হিসেবে। কিন্তু
স্থাকার করতে বাধা নেই, ভার্জিনিয়ার চ্যান্টিলিতে
স্থিতসৌনিয়ান এয়ার অ্যান্ড স্পেস মিউজিয়াম
স্টিভেন এফ উদ্ভাব-হ্যাঙ্জি সেন্টারে স্পেস শাটল
(মহাকাশ যান) পরিদর্শন আমাকে যারপরনাই মুঝে
করেছে। এত বড় বড় উড়োজাহাজ, মহাকাশ যান
এক জায়গায় জড়ে করে পরিদর্শনের ব্যবস্থা করার
পদ্ধতিটি দারকণ উৎসাহব্যৱজ্ঞক।

রাইট ব্রার্সের প্রাচীনতম প্লেন থেকে শুরু করে
আধুনিক প্লেন সবাই আছে এখানে। সেই থেকেই
বোৰা যাচ্ছে মিউজিয়ামের বিশালতা! মিউজিয়ামে
আমি যে পথে চুকেছি, কিছু দূর যাবার পরই
দেখলাম কনকর্ড। এটিকে অবশ্য অতিরিক্ত শব্দ
দূরগের কারণে পৃথিবীতে বাতিল করা হয়েছে।
কনকর্ড একবার বাংলাদেশে এসেছিল। তখন আমি
ছোট। মনে আছে কেউ কেউ গল্প করেছিল উত্তরার
অনেক উচু বিচ্ছিন্নে দেয়ালে ফাটল দেখা দিয়েছিল।

কতৃক

সত্য ছিল জানি না।

পৃথিবীর সবচেয়ে ছোট প্লেন, বোমাবাজ দীর্ঘ
ফাইটার প্লেন, সব ধরনের মিসাইল, কি নেই
এখানে। তবে সবচেয়ে ভালো লেগেছে ডিসকভারি
দেখে। এটা মহাশূন্য পাড়ি দিয়ে এখন এই
মিউজিয়ামে অবস্থান করছে।

ডিসকভারি সম্পর্কে এই কথ গুলো লেখা রয়েছে
মিউজিয়ামে— সবচেয়ে বেশি সময় ধরে চলা
অরবিটার, ডিসকভারি ১৯৮৪ থেকে ২০১১ সাল
পর্যন্ত ৩৯ বার উড়েছে। এটি যে কোনো মহাকাশ
যানের চেয়ে বেশি মিশন সম্পন্ন করেছে, মহাকাশে
মোট ৩৬৫ দিন ব্যয় করেছে। ডিসকভারির দীর্ঘ
বছরের পরিসেবার হাইলাইটগুলির মধ্যে রয়েছে মীর
স্পেস স্টেশনের সাথে প্রথম ডকিং মিশন, আন্তর্জাতিক
স্পেস স্টেশনের সাথে প্রথম ডকিং এবং হাবল স্পেস
টেলিস্কোপ স্থাপন। ডিসকভারি প্রথম আফ্রিকান-
আমেরিকান নারী কমান্ডার দ্বারা উড্ডয়ন করা
হয়েছিল এবং প্রথম নারী মহাকাশ যানের পাইলট

দ্বারা চালিত হয়েছিল।
ডিসকভারির সামনে মিনিট
কুড়ি অক্ষরগেই দাঁড়িয়ে
ছিলাম। মিউজিয়ামের
আলো আঁধারিতে
ভালো ছবি তুলতে
পারছিলাম না, তার
ওপর ডিসকভারির
সামনে ছিল
পর্যটকদের দারুণ
ভাড়। মন ভরছিল না
কিছুতেই।
ডিসকভারির চারদিকে
একবার ঘুরতেই তো ৫
মিনিট লাগে। সাথে
থাকা জামিল ভাই তাড়া
দিলেন— ‘আপা, একটিতে
এত সময় দিলে, পুরো
মিউজিয়াম কখন দেখবেন’।
তাই তো!

ডিসকভারি দেখা শেষ হলে
দেখলাম অ্যাস্ট্রোনাটদের চাঁদে ব্যবহার
করা সেই স্পেস সুট। মিউজিয়াম
থেকেই জানতে পারলাম, এ পর্যন্ত ১২ জন
আমেরিকান অ্যাস্ট্রোনাট চাঁদে পা রেখেছেন।

আনেকে ভুল করে হয়তো ওই অ্যাপোলো ১১-তে
আর্মস্ট্রং আর অলিভিনসন শুধু চাঁদে গিয়েছিলেন। এই
মিউজিয়ামে আরওইনের (১২ জনের একজন) পুরো

স্পেস সুটটা আছে।
প্রজাপতি ও মাকড়সাও মহাকাশ দর্শন করেছে।
প্রজাপতিগুলো জিরো গ্র্যাভিটিতে তাদের পুরো
লাইফ সাইকেল সম্পন্ন করেছে সফলভাবে, কোনো
সমস্যা হয়নি। আর মাকড়সার ক্ষেত্রে দেখা হয়েছে
এই ছোট মাকড়সাগুলো জিরো গ্র্যাভিটিতে, একটা
জাল পৃথিবীতে যেমনটা নিখুঁতভাবে তৈরি করতে
পারে সেখানে পারে কিনা। দেখা গেছে প্রথম দিকে
অসুবিধা হয়েছে, পরে সে নিজেই তৈরি করে
নিয়েছে। মাকড়সা দুটোর নাম আনিতা এবং
এরাবেলা।

স্পেস মিউজিয়ামের বর্ণনা এত অল্পতে শেষ হতেই
পারে না। ঠিক মতো বর্ণনা করলে ছোট একটি
বুকলেট তৈরি হয়ে যাবে! ফিরবার সময় সুভ্যোনির
শপে টুঁ দিলাম। মনে মনে কার্লোসকে ধন্যবান
জানালাম।

লেখক: পর্যটক ও শিক্ষক ◆



পান্ত্ৰমাই ঝৱনাৰ টানে

■ শিমুল খালেদ

সিলেট শহৰ ছেড়ে আমাদেৱ বাহন মালনীছড়া চা বাগানে প্ৰবেশ কৰাৰ সময় চোখে পড়ে আকাশে মেঘেৰ ঘনঘটা। ধূসৰ মেঘেৰ দঙ্গল ক্ৰমশ দখল নিছে দৈশান কোণেৰ। অনভূতিতে তখন মিশ্ৰ অনুভবেৰ সংঘাত! ঝৱনাৰ প্ৰবল প্ৰবাহ দেখাৰ জন্য তো বৃষ্টিময় দিনই চেয়েছিলাম। আবাৰ বাড় তুফান হলো না জানি কী হয়! যাছি পান্ত্ৰমাই ঝৱনাৰ মাধুৰ্যেৰ টানে। সকালবেলো টিলাগড়ে বাসা হতে বেৰ হতে না হতেই ভ্ৰমণ আয়োজক রাফিৰ ফোন। আনন্দখানায় পৌছে দলেৱ সাথে মিলিত হওয়াৰ পৰই যাত্ৰা শুৱ হয়। চা বাগানেৰ মসংগ সুবুজ রাজ্যপাট ছেড়ে আমৰা তখন সালুটিকৰে। সিলেটেৰ উত্তৰ সীমান্ত লাগোয়া পাহাড়ি নদীৰ উভয়েলিত পাথৰগুলোৰ বড় অংশ এখানে পৌছায়। আমাদেৱ বাহন মোড় নিয়ে এবাৰ ছেট রাস্তায় প্ৰবেশ কৰে। সেই পথে যেতে যেতে এক সময় বৃষ্টি নামে। তবে ততটা বেগ নেই বৃষ্টিতে। দৈশান কোণেৰ মেঘও ক্ৰমে সৱে গিয়ে আকাশ অনেকটা পৱিকার। চলত বাহনেৰ জানালাৰ কাচ সৱিয়ে পথেৰ দুইপাশটা দেখতে থাকি। প্ৰায় এক দশক পৰ এইপথে দ্বিতীয় বাৰ আসা। সে বাৰ পথেৰ দুই ধাৰে প্ৰচুৰ ঘাসবন আৱ নলখাগড়াৰ বোৰ দেখেছিলাম। এবাৰ অবশ্য বৰ্ষাকাল হওয়াতে তাৰ বড় অংশই পানিৰ নিচে থাকায় দৃষ্টিগোচৰ হয়নি। আমাদেৱ আপাত গন্তব্য গোয়াইনঘাটেৰ হাদাৰপাৰ বাজাৰ। গন্তব্যস্থলে পৌছাব সময় ঘড়িৰ কাঁটা দুপুৰেৰ ঘণ্টায় কড়া নাড়ছে। হাদাৰপাৰ বাজাৰেৰ পাশ দিয়ে বয়ে গেছে পিয়াইন নদী। নদীৰ পাশ যেমেঁ দাঁড়ানো এক রেষ্টোৱায় নাস্তাৰ পৰ্য সেৱে সদলবলে হাজিৰ হয়ে যাই খেয়াঘাটে। এবাৰ আমৰা যাত্ৰী হৰো নৌপথে। নদীৰ ঘাটে নানা রংয়েৰ নৌকা ভেড়ানো। কিছুক্ষণ পৰ পৰ যাত্ৰী নিয়ে মাৰিৰা ছুটছেন বিভিন্ন গন্তব্যে। দলেৱ সবাই ঠিকঠাক বচেড়ে বসাৰ পৰ মাৰি নোঙৰ তুলনেন। শ্ৰোতসিনী নদী পিয়াইন। দুৱে সীমান্ত পেৱিয়ে মেঘালয়েৰ পাহাড় কোলে তাৰ জন্ম। পাহাড়েৰ সন্তান হলো চলতে চলতে যেন আৱও আপন কৰে নিয়েছে এই ভাটিৰ দেশ। তাই তো তাৰ বুকজুড়ে এতো কৰ্মজ্ঞ! রোদে পোড়া তামাটে চেহাৰা নিয়ে তাৰ বুকে শ্ৰমজীবীদেৱ অংশে তুষ্ট হওয়াৰ হাসি দেখে সেও নিশ্চয় অস্ফুটে হাসে। নদীতে বেশ স্বোত তখন। ঊজান থেকে নেমে আসা প্ৰবল পাহাড় ঢলে বৰ্ষাকালে পিয়াইন থাকে এমন খৰদ্দোতা। যেতে যেতে চোখে পড়ে



নদীজুড়ে নানা ব্যস্ততা। যাত্রীবাহী ইঞ্জিনচালিত নৌকা ছুটেছে নদীর মূলস্নেত ধরে। নদীর পাড় ধরে মাছ ধরছে কিছু জেলে নৌকা। একটা দুইটা পাথরবাহী নৌকাও আমাদের পাশ কেটে চলে যাচ্ছে। এই নৌকার নাম ‘বারকি নাও’। সিলেটের খরস্নেত পাহাড়ি নদীগুলোতে ঐতিহ্যবাহী এই বারকি নাওয়ের একচ্ছত্র দাপট। বিশেষত বালু পাথর উভেলন আর পরিবহনের কাজে লাগে বারকি। লম্বাটে চিকন গঠন হওয়াতে সহজেই প্রবল দ্রোতেও চলতে পারে। সম্পৃতি সিলেটের একজন খ্যাতনামা সাংবাদিকের অনুসন্ধানে জানা গেছে, বারকি নামটি এসেছে একজন বিটিশ নাগরিকের নাম থেকে। মি. জন বারকি নামক জনৈক বিটিশ নাগরিকের নকশায় তৈরি হয়েছিল বিশেষায়িত এই নৌকা। উভাবনের সময়টা ছিল ১৭৫৭ থেকে ১৯০০ সালের মধ্যবর্তী কেন্দ্রে এক সময়। চলতে চলতে পিয়াইন এবার বাঁয়ে মোড় নিয়েছে। তবে আমাদের গন্তব্য অন্য পথে হওয়াতে এবার পিয়াইনের সাথে বিচ্ছেদ ঘটাতে হলো। নৌকার গতিপথ বাঁক নিয়েছে এবার ছোট একটা খাল ধরে। মাঝির কাছ থেকে জানলাম, এটা পিয়াইনের একটা শাখা নদী। স্থানীয়ভাবে পিয়াইন খাল নামে পরিচিত। খালটি ততটা গভীর নয়। আর তাই নৌকা চলছিল ধীরে, দেখেশুনে। তারপরও হঠাত হঠাত নৌকার তলা নদীর ডুবো তলে আটকে যাচ্ছে। এ ব্যাপারে দলের চঞ্চল দুই সদস্য কৃষ্ণ আর নাইম ছিল বেশ তৎপর। পানিতে বাঁপিয়ে পড়ে ঠেলে নৌকার চলাচল স্বাভাবিক রাখছে। খালের অগভীর পানি একদম স্ফটিক স্বচ্ছ। টলটলে এই পানির উৎস উজানে পাতুমাই বারনা। তলদেশের বালু, খনিজ পাথরে সূর্যোলক প্রতিফলিত হয়ে চিকচিক করছে। খালের একপাশ ধরে অন্তি দূরে চলে গেছে মেঘালয় পাহাড়শেণি। যেন হাত বাড়ালেই ছাঁয়া যাবে! অন্য পাশের ভূমিরূপ টিলাময়। সুপারি, আনারস, লেবু ইত্যাদি ফল-ফসলের প্রাচুর্য চোখে পড়ে। পাঢ়ের সবুজ মঙ্গ ঘেসো জমিতে চৰাতে ভেড়ার পাল। বাঁশের ঝুড়িতে করে এক শ্রমজীবীকে কিছু একটা ধোতে দেখে জিজেস করে জানলাম, ওটাতে কয়লার টুকরো। স্নোতের তলদেশ থেকে উভেলিত এসব কয়লা তেসে এসেছে বারনার পানিতে। দূর থেকেই বারনার পতনের শব্দ কানে আসছিল। তারপর বাঁক পেরোতেই দূর হতে চোখে ধরা দেয় পাতুমাইয়ের মোহুয়ীয় রূপ। মাঝি খালের একপাশে নৌকা নোঙ্গের করলেন। সুন্সান পড়ত দুপুর। মুঝ করা সবুজের দৃশ্যপটে চারপাশজুড়ে আবাক নীরবতা। সেই নীরবতা ভেঙে দূর হতে কর্ণকুহরে মোলায়েম পরশে বাঁকার তুলেছে বারনার বারবার শব্দমালা। মেঘালয় পাহাড়জুড়ে ঘন কালচে সবুজ অরণ্য। অরণ্যের ঠাস বুনোটের ভেতর দিয়ে শৈলশেণির বুক বেয়ে নেমে এসেছে পাতুমাই বারনার ধ্বনিতে সাদা প্রবাহ। রাত আর সকালে বৃষ্টি হওয়াতে প্রবল গর্জনে পাতুমাই ফঁসেছে যেন। পাতুমাই নামের ছবির মতো সুন্দর এক সীমান্ত গ্রাম, মেঘালয় পাহাড়ের কোল ধৈঁয়ে যার অবস্থান। পর্মটকদের কারো কারো চোখে যেটি দেশের সুন্দরতম গ্রামগুলোর একটি। আর সেই গ্রামের নামেই পাতুমাই বারনার নামকরণ। সীমান্তের ওপাশে যার নাম বড়হিল ফলস। মেঘালয়ের ইস্ট খাসি হিলস জেলায় পড়েছে বারনাটির উৎপত্তিস্থল। কাপড় বদল করে এবার নেমে পড়ি পাহাড়ি নদীর স্নোতে। শরীরে পানির ছাঁয়া লাগতেই হিম শীতল স্পর্শে পুলকিত হলাম। শৈলশেণি, ঝুড়িপাথর আর অরণ্যের গহীন তল ছুঁয়ে আসা জলধারা তো এমন শীতল হবেই! পাহাড়ি নদীর ভরা স্নোত যেন কৈশোরে ফিরিয়ে নিয়ে গেল। দল বেধে সাঁতার



কাটলাম। ডুব দিই পানির একদম তলদেশে। শ্বাস আটকে প্রাণ ভরে দেখি নদীর তলদেশের প্রাণবৈচিত্র্য। কাদি আর সাদা বালুর ওপর জনোছে শ্যাওলা আর জলজ উত্তি। ছোট ছোট মাছেরা সাঁতরে লুকোচ্ছে পানিতলের সেই বনে। আমাদের সাথে পান্না দিয়ে সাঁতারছে রাজহাঁসের দল। কঢ়ে তাদের বিচ্ছিন্ন শব্দ। নদীর পাড়ে লতাগুল্য অর্কিডের আটোসাটো বুনোটে বাধা পড়া বয়সি বৰ্ষ। সহচর হয়ে পাশে আদিকালের সাঙ্গী হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা মেঘালয় পাহাড়। মনে পড়ে যায় জীবনানন্দ দাশের কালজয়ী কবিতার কথেকটি পংক্তি- ‘পৃথিবী আৰও প্ৰীৰী হয়ে যায় মিৰজিন নদীটিৰ তাৰে/ পৃথিবীৰ রাঁজহাস নয়, নিবিড় নক্ষত্র থেকে যেন সমাগত সন্ধ্যাৰ নদীৰ জলে

এক বাক রাজহাঁস আই।’ নিজেকে জিজেস করি, জীবনানন্দ ও কি দাঁড়িয়েছিলেন প্রাচীন পৃথিবীর যোগসূত্রের এমন কোনো দৃশ্যপটে? নৌকার ভেতর থেকে হাকডাকে খেয়াল হয় এতোক্ষণে পেট চোঁ চোঁ করছে। ফেরার পথে দিনের আলো আস্তে আস্তে ফিকে হয়ে এলো। বিকেলের নীরবতা ভেঙে ইঞ্জিনচালিত নৌকার টেউ চাঞ্চল্য তুলেছে শ্রেতে। সেই শব্দে হতচকিত হয়ে ঘাসবন থেকে উড়ে পালায় এক বাঁক মুনিয়া। মেঘালয় পাহাড় ঝাপসা কালচে চেহারায় ক্রমশ হারাচ্ছে দূরে। আর আমরাও যেন জীবনানন্দের মিৰজিন নদী ধরে ছুটে চলি ঘরে ফেরার অভিপ্রায়ে। পেছনে পড়ে রঘ পাতুমাইয়ের মাতাল করা বারবার সূর মুঞ্চা।
লেখক: ব্যাংক কৰ্মকর্তা ◆

সাতছড়িতে ছয়জন

কল্পনা

■ মো. সাহিদ হোসেন

অনন্তরোধের অতিশয়ে একটি পারিবারিক ভ্রমণ পরিকল্পনা করতে হয়েছে। অর্ধ শতাব্দী ধরে যদের সাথে যোগাযোগ নেই, এমনই একগুচ্ছ আত্মীয় আমাদের খুঁজে বের করলো। এদের পূর্বপুরুষ (পূর্বনারীও বলা যায়) অভিবাসন প্রক্রিয়ায় বসতি স্থাপন করেছিল হিংগঞ্জের চুনারঘাটে।

আমাদের পৈতৃক বাড়ি নরসিংহদী জেলার রায়পুরার বেলাবো এলাকায়। আমরা যখন একেবারে শিশু, তখন আমাদের চাচাতো বেন বিলাতি বুচাব (বিলাতি বুবু- এই নামটাই আমরা জানতাম, অন্য কোনো নাম ছিল কিনা জানি না) এবং তার এক বেন সপরিবারে স্থানস্থরিত হয়েছিলেন চুনারঘাটে।

আমাদের এলাকার অল্প জমি বিক্রি করে ওথানে বেশি জমি কেনা যেতো। অভিবাসনের টাই ছিল কারণ। ১৯৭০ সালের দিকে একেবার আমি ওই বাড়িতে গিয়েছিলাম বেড়াতে।

এরপর অনেক বছর পেরিয়েছে। বৃদ্ধিগঙ্গার পানি অনেক কল্পিত হয়েছে। জীবনের সকাল, দুপুর, বিকাল পেরিয়ে সক্ষ্য উৎকুঠিত দিচ্ছে। শরীর শিথিল আর ভারী হয়েছে। মাথার ওপর চুলের সংখ্যা এবং রঙয়ে পরিবর্তন এসেছে। এর মাঝেই এই ঘটনা। আমাদের চাচাতো বেন-দুলাভাইগণ অন্য জগতে পাড়ি জমিয়েছেন। উনাদের কন্যারা এবং তদীয় পুত্র-কন্যারা আমাদের খুঁজে বের করলো এবং চেপে ধরলো। একেবার মেতেই হবে বেড়াতে। দিনরাত ফোন করে ওরা আমাদের উত্তৃত্ব করতে লাগলো।

অবশ্যে ভালোবাসার ‘অত্যাচার’ অতিষ্ঠ হয়ে চুনারঘাট বেড়াতে যাওয়ার পরিকল্পনা করলাম। আমরা অনেক ভাইবেন। মাত্র তিন দুগুণে ছয়জন বাজি হলো যেতে। আমার বড়ভাই আর আমি সন্তোক, আর আমার ছেটবেন মিনি সস্থামীক। একটা ভাড়া করা মাইক্রোবাস নিয়ে সকাল সকাল রওনা দিলাম ছয়জন। দীর্ঘ শুশুমণিত চালক হর্ন বাজানোতে পরাদশী, অন্য চালকদের মতোই। অনেকদিন আগে দাঙ্গুরিক কাজে কলঞ্চে গিয়েছিলাম, দেখা হয়েছিল বৃটিশ নাগরিক জেরি ক্লুটেরের সাথে। কথায় কথায় জানা গেল- বাংলাদেশে যাওয়া না হলেও নেপালে ছিলেন পাঁচ বছর। ওখানে অবস্থানের সময়ে যে বিষয়টি তার কাছে সবচেয়ে লক্ষণীয় মনে হয়েছে তা হলো, নেপালের ড্রাইভাররা খুব বেশি হর্ন বাজায়। ‘বাংলাদেশের ড্রাইভারারও কি একই রকম?’ জেরির জিজ্ঞাসা। আমার জবাব ইতিবাচক। হর্ন বাজানো তো ড্রাইভারদের প্রধান বিমোদন।

এক সন্তানের প্রোগ্রামে জাপানে গিয়েছিলাম। পুরো সময়ের মাঝে একজন বাস ড্রাইভারকে একেবার হর্ন বাজাতে শুনেছি, ব্যাক গিয়ার দিতে গিয়ে। জাপান ড্রাইভারের বোকামিতে বাংলাদেশ আর নেপালের ড্রাইভার নিশ্চয়ই হাসবে। হর্ন না বাজালে গাড়ি চালানোর আনন্দ কোথায়!

নরসিংহদী গিয়ে মনে পড়ল- আত্মীয় বাড়িতে নেয়ার জন্য আগের দিন যে মিষ্টি কিনেছিলাম ওগুলো রেখে এসেছি। কিছুক্ষণ দোষারোপ চললো। তারপর সিদ্ধান্ত হলো নাশতা খাওয়ার জন্য যেখানে থামবো, ওখান থেকেই মিষ্টি কিনে নেবো। নাশতার বিরতি



চুনারঘাট কলেজ গেটে কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর দেখা মিললো
আমাদের এক্ষেপ্ট টিমের। এখান থেকে আরও পনেরো কিলোমিটার দূরে যেতে হবে গ্রামের ভেতরে। টিম লিডার সাদেকের গাড়ি অনুসরণ করে চললাম। রাস্তা বেশ খারাপ। এটুকু পথ পাড়ি দিতে লাগলো প্রায় এক ঘণ্টা। গিয়ে দেখি এলাহি কাণ্ড। বাড়ির উঠানে শামিয়ানা টানানো, আর ডেকোরেটেরের চেয়ার টেবিল সাজানো; একেবারে বিয়ে বাড়ির মতো। ছয়জন অতিথিকে আপ্যায়নে আরও প্রায় ঘাটজন পার্শ্ব অতিথিকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। এ বাড়ির মালিক থাকে সৌন্দি আববে। তার পরিবার এবং বর্ধিত পরিবারের সদস্যরা এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। এখানকার চেয়ারম্যান, মেঘার, হেড মাস্টার, গণ্যমান্য সবাই এখানে আমন্ত্রিত।

আশুগঞ্জের উজান ভাটি হাইওয়ে রেস্টুরেন্টে। ভালোই। আমাদের সঙ্গী নারীদের সবার পরনে ছিল শাড়ি। অচেনা একটা মেয়ে এগিয়ে এসে বললো- ‘আপনারা সবাই শাড়ি পরেছেন? খুব সুন্দর লাগছে আপনাদের’। মেয়েটির পরনে ছিল সালোয়ার কামিজ। শাড়ি কি এভাবে দর্শনীয় বস্তে পরিগত হবে? মিষ্টি কিনে, প্রয়োজনীয় ব্যক্তিগত যোগ আর বিয়োগ শেষে আবার রওনা। সরাইল মোড় পার হওয়ার পর রাস্তায় যানবাহন কমতে লাগলো। কিছুক্ষণ পর মাধবপুর। অর্ধ শতাব্দী আগে যখন এসেছিলাম, মাধবপুর তখন ছিল ছোট একটা বাজার। এখন রীতিমতো শহর। আরও কিছুদূর এগিয়ে পানসি হাইওয়ে রেস্টুরেন্টে সংক্ষিপ্ত স্বাস্থ্য বিরতি। আবার

সচল গাড়ির চাকা। এবার তেলিয়াপাড়া। সীমান্তসংলগ্ন একটি রেলস্টেশন। মুক্ষ্যবন্দের সময় তেলিয়াপাড়ার নাম অনেক শুনেছি। সিলেট বিভাগে হলেও ব্রাহ্মণবাড়িয়ার পার্শ্ববর্তী জেলা হিংগঞ্জে মূল সিলেটের প্রাকৃতিক, নেসর্গিক বৈচিত্র্য পুরোপুরি দেখা যায় না। তবু চা বাগানের মাবাখান দিয়ে চলতে গিয়ে পুরোনো কথাটাই আবার মনে পড়লে- Journey is more important than the destination. দুই পাশে চোখ জুড়নো সবুজ। রাস্তায় যানবাহনের ভিড় নেই। কোলাহল দূষিত দাক থেকে বেরিয়ে এসে কিছু সময়ের স্ফুরণ। চুনারঘাট কলেজ গেটে কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর দেখা মিললো আমাদের এক্ষেপ্ট টিমের। এখান থেকে আরও পনেরো কিলোমিটার দূরে যেতে হবে গ্রামের ভেতরে। টিম লিডার সাদেকের গাড়ি অনুসরণ করে চললাম। রাস্তা বেশ খারাপ। এটুকু পথ পাড়ি দিতে লাগলো প্রায় এক ঘণ্টা। গিয়ে দেখি এলাহি কাণ্ড। বাড়ির উঠানে শামিয়ানা টানানো, আর ডেকোরেটেরের চেয়ার টেবিল সাজানো; একেবারে বিয়ে বাড়ির মতো। ছয়জন অতিথিকে আপ্যায়নে আরও প্রায় ঘাটজন পার্শ্ব অতিথিকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। এ বাড়ির মালিক থাকে সৌন্দি আববে। তার পরিবার এবং বর্ধিত পরিবারের সদস্যরা এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। এখানকার চেয়ারম্যান, মেঘার, হেড মাস্টার, গণ্যমান্য সবাই এখানে আমন্ত্রিত।

চুনারঘাট উপজেলার এই জায়গাটার নাম গাজীপুর। এখান থেকে দেড় কিলোমিটার দূরে ভারতের সীমান্ত। কথাবার্তায় বোঝা গেলো- অর্ধ শতাব্দীর বেশি সময় পার হয়ে গেলো পূর্বপুরুষদের অভিবাসী তকমাটা এখনো ওদের গায়ে লেগে আছে। এখানেই জমিজমা, চাষবাস, ব্যবসা-বাণিজ্য। স্থানীয় পরিবারে ছেলেমেয়ের বিয়ে দিয়ে সম্পর্ক স্থাপন করে জনস্তোত্রের মূলধারায় যুক্ত হবার প্রয়াস। এতকিছুর পরও স্থানীয় অস্থানীয় ভেদেরেখাটা ঘোচেন। ‘ওদের কোনো সমস্যা হলে আমরা ওদের পাশে থাকি’। চেয়ারম্যান সাহেবে একথা বলে প্রচলিতভাবে বুঝিয়ে দিলেন মাঝে মাঝে সমস্যা হয়। বোঝাই যাচ্ছে খাবারের আয়োজনে বাড়াবাড়ি ছিল। দ্বিপদ, চতুর্পদ, জলচর প্রাণিজ আমিয় ছাড়াও শাকসবজি, ভর্তা-ভাজি, পোলাও, সাদা ভাত, দই-মিষ্টি কোনোকিছু বাদ যায়নি। ব্যাপক সাধাসাধি, চাপাচাপির মাঝে ভোজন পর্ব শেষ হলো।

আমাদের পরবর্তী গন্তব্য হবিগঞ্জ। ওখানেই রাত্রি যাপনের আয়োজন। ভ্রমণ আর ভোজনে ক্লান্ত শরীরে। কিন্তু মেজবানদের বায়নার শেষ নেই। এক পল্লী ডাঙ্করের বাড়িতে যেতে হলো চা খেতে। ফেরত পথে চুনারুঘাট শহরের কাছে বিলাতি বুচাবের মেয়ে মাজেদার বাসায় যেতেই হলো। মাজেদার ভাষ্যমতে এক কিলোমিটার, আদতে শহর থেকে পাঁচ কিলোমিটার দূরে।

এর মাঝে হবিগঞ্জের সাংবাদিক শোয়ের চৌধুরী কয়েকবার খোঁজ নিয়েছেন আমাদের। অতি সজ্জন এই দ্রুলোকের কথা আমি কখনো ভুলবো না। উনার সাথে আমার সরাসরি কোনো পরিচয়ও নেই। আমার অফিস থেকে হবিগঞ্জে রাত্রি যাপনের জন্য হোটেল বুকিংয়ের অনুরোধ জানানো হয়েছে উনাকে। প্রত্যাশার চেয়ে অনেক বেশি আন্তরিকতায় উনি সে অনুরোধ রক্ষা করেছেন।

হবিগঞ্জ পৌছাতে সন্ধ্যা পার হলো। সোনার তরী হোটেলের সামনে দাঁড়িয়ে হাসিমুখ শোয়ের চৌধুরী। চেক-ইনের আনুষ্ঠানিকতা সারলেন উনিই। এরপর অপ্রত্যাশিত একটি অনুরোধ। রাতের খাবার থেকে হবে উনার বাসায়। অনেক আপত্তিতেও কাজ হলো না। নেশভোজ উনার বাসায়ই।

আঢ়াই ঘণ্টার মাঝে কেনাকাটা, রান্নাবান্না সেরে চমৎকার আয়োজন করলেন এই দম্পত্তি। ভাবির আতিথেতা আসাধারণ। এত অল্প সময়ের নোটিপিসি এতগুলো মানুষ খাওয়ার জন্য হাজির- কোনো বিরক্তি ছাড়া শতভাগ আন্তরিকতায় আপ্যয়ন করালেন সুশাদু ঘৰোয়া ব্যঙ্গে। গল্প করালেন, ছবি তুললেন যেন কত কাছের পরমাত্মায়। আজ আমাদের আত্মায় দিবস। পুরোনো আত্মায় বাড়িতে বেড়ালাম, নৃত্ব আত্মায়ের খোঁজ পেলাম। ঢাকার বাইরে এসেছি। একটা দর্শনীয় স্থান দেখে যাওয়া উচিত। শোয়ের ভাইয়ের সাথে কথা বলে সিদ্ধান্ত হলো, কাল ফেরার পথে সাতছড়ি জাতীয় উদ্যান দেখে যাবো। রাতে হোটেলে ফিরলাম। এভাবেই কাটলো একটি আপ্যয়নমুখর দিন।

সকালে নাশতা করে রওনা হলাম। সাতছড়ি পৌছাতে ঘটাখানেক লাগলো। পর্যটকের ভিত্তি মোটামুটি। সেন্ট মার্টিন বা সুন্দরবনের করমজলের



মতো এত কোলাহল নেই। টিকিট কেটে ভেতরে ঢুকে একটা পায়ে হাঁটা সেতু পার হলাম। নিচে পানি নেই। বর্ষার সময় পাহাড়ি ঢলে প্লাবিত হয়। এই জলধারাগুলোকেই বলা হয় ছড়া বা ছড়ি। গাছের ছায়াঘেরে পথ ধরে হাঁটা সব সময়ই আনন্দের। সুন্দরবন, রাজামাটি, চিহুক, লাওয়াছড়ার সবুজ বনানী কখনোই ক্লাসিকর, একঘেয়ে মনে হয় না। একবার বেড়িয়ে এলে আবার যেতে ইচ্ছে করে। কিন্তু আজ এই সাতছড়ির উদ্যানে এসে ভিজ একটা অনুভূতি জাগলো মনে। এই উদ্যানের যারা অধিবাসী-বৃক্ষ-লতা, ফুল-পাথি, সাপ-ব্যাঙ, বানর-এরা কত স্বাধীন, স্ফীনভর! এই উদ্যান ওদের নিজস্ব আবাসভূমি। এখানকার মাটি, পানি, বাতাস, সূর্যোলক ওদের আহার জোগায়। কোনো পরিচর্যার প্রয়োজন হয় না। মানুষের অহেতুক আনাগোনা ওদের জন্য বিরক্তিকর। মানবজীবনের জটিলতা

ওদের স্পর্শ করে না। উন্নত প্রযুক্তি, আর্থসামাজিক উন্নয়ন, মাথাপিছু আয়, রাজনীতি, কৃটনীতি, যুদ্ধ, শাস্তি আলোচনা, জাতিসংঘ, বিশ্বব্যাংক ওদের জীবনে অপ্রাসঙ্গিক। মানুষেরও যদি হতো এমন একটি হানাহানিমুক্ত শাস্তির জীবন!

সাতছড়িতে আমাদের অবস্থান দীর্ঘ হয়নি। মূলত পথ ধরে হাঁটা আর ছবি তোলার মাঝেই সীমিত রইলো আমাদের ভ্রমণ। একটা অবজারভেশন টাওয়ার আছে। আবর বয়েছে এক ঘন্টার একটা ট্রেইল। যাটোৰ্ধ ব্যাসি আমাদের এই দলের সবাই অতুল শক্ত সমর্থ নয়। ওসবের মাঝে আবর যাওয়া হলো না।

এবার ফেরার পালা। সাতছড়ি ছেড়ে ছয়জন রওনা হলাম ঢাকার পথে। পেছনে পড়ে রইলো আত্মায় পরিজন আব উদ্যানের সুস্থী অধিবাসীরা।

লেখক: কবি ও অনুবাদক ◆



ভ্রমণ গাইডের প্রশিক্ষণ নিলেন ৫০ নারী

■ পর্যটন বিচিত্র প্রতিবেদন
ভ্রমণ গাইডের কাজের হাতেখড়ি নিলেন ৫০ জন নারী। ১৬ থেকে ১৮ মার্চ রাজধানীর বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের মিলনায়তনে তিনি দিনের এই প্রশিক্ষণ হয়।

প্রশিক্ষণার্থীদের কেউ বিশ্ববিদ্যালয়পড়ুয়া, কেউ সদ্যাতক, কেউবা চাকরিজীবী। সবাই তারা ভ্রমণ গাইড হতে চান। সেই আগ্রহই তাদের এক ছাদের তলে জড়ো করা হয়েছিল। প্রশিক্ষণটির মৌখিক আয়োজক ছিল বাংলাদেশ ট্রারিজম বোর্ড ও নারীদের ভ্রমণ সংগঠন ‘ভ্রমণকন্যা-ট্রাভেলেটস অব বাংলাদেশ’। ‘ভ্রমণকন্যা’র সহকারী সাধারণ সম্পাদক মানসুরা হক বলেন, ‘আয়োজনটা আমরা দ্বিতীয়বারের মতো করেছি। শতাধিক আবেদনকারীর মধ্য থেকে

প্রশিক্ষণের জন্য এই ৫০ জনকে নির্বাচন করা হয়েছিল। এই প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্য থেকে নির্বাচিত পাঁচজনকে আমরা ভ্রমণকন্যা টিমে গাইড হিসেবে তিনি মাসের ইন্টার্নশিপের সুযোগ দেব। অন্যরা নিজেদের মতো কাজ করতে পারবে।’ তিনি দিনের প্রশিক্ষণটি কয়েকটি পর্বে সাজানো হয়েছিল। ভ্রমণ সমন্বয়কারী হিসেবে যোগাযোগ দক্ষতা, আয়োজন, দলবেঁধে বেড়াতে গিয়ে সংকটময় পরিস্থিতি মোকাবিলাসহ নানা বিষয়ে অভিজ্ঞরা

প্রশিক্ষণ দেন। প্রশিক্ষণার্থীরা জানান, তারা ভ্রমণ করতে ভালোবাসেন। গাইড হিসেবে কাজের সুযোগ পেলে ঘোরাঘুরির কাজটি আবও সহজ হবে। নিজেকে প্রস্তুত করার জন্য কর্মশালায় গাইডলাইন পেয়েছেন তারা। দেশের নারীদের ভ্রমণে আগ্রহী করার পাশাপাশি পর্যটনশিল্পে নারীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছে ভ্রমণকন্যা। ‘ভ্রমণ সমন্বয়কারী’ তৈরির উদ্যোগ নারীদের সংগঠনটির তেমনই এক কর্মসূচি। ◆



সীমান্ত ধরে দ্বিচক্রযানে ২৪০ কি.মি!

অ্যাডভেনচুর

■ মো. আনিসুর রহমান
বাইসাইকেল একমাত্র বাহন; যা দিয়ে
দেশের ভেতরে শঙ্খ খরচে ছিটিয়ে ছড়িয়ে
থাকা প্রকৃতির সৌন্দর্যকে সম্পূর্ণভাবে
উপভোগ করা যায়। হেমন্ত রাইডার্স
সাইক্লিস্টদের একটি সংগঠন। হেদায়েতুল
হাসান ফিলিপ এর প্রতিষ্ঠাতা। আমার
ছোটভাই আমানও এর একজন সংগঠক।
হেমন্ত রাইডার্সের বৈশিষ্ট্য হলো এরা যেমন
সান্তানিক ফ্রাইডে লং রাইডে ঢাকা থেকে
বিভিন্ন দিকে যায়, আবার প্রতিমাসে একটা
লং রাইডের আয়োজন করে যেটা
বাংলাদেশের কোনো অ্যাডভেঞ্চারপূর্ণ রুট
পরিক্রমণ করে। যেমন- শ্রীমঙ্গলের রেমা-
কালেঙ্গা, টেকনাফ থেকে মেরিন ড্রাইভ
ধরে কক্সবাজার, রাঙামাটি থেকে কান্তাই
লেকের তীর ধরে বান্দরবান, সুন্দরবন,
মনপুরা, নিবুপু দ্বীপ, সুনামগঞ্জের
তাহিরপুরের শিমলু বাগান ইত্যাদি। ৩৪-
৩৬ জন সাইক্লিস্টের একটা দল ঢাকা
থেকে ভাড়া করা বাসে বা লক্ষে করে
নির্দিষ্ট রুটের একপ্রাতে পৌঁছায় আবার ট্যুর
শেষ করে রুটের অন্য প্রান্ত থেকে বাসে বা
লক্ষে করে ঢাকায় ফেরে। সাইকেলগুলো
বাক্সবান্ডি করে বাসের ছাদে অথবা লক্ষে
করে নেয়া হয়। রাত্রিপান কখনো
হোটেলে কখনো তাঁবুতে করতে হয়। ১/৩
দিনের ট্যুরে স্থানভেদে খরচ হয় ২০০০-
৩০০০ টাকা।

আমি খুলনাতে থাকলেও মাঝে মাঝে
ওদের এই অ্যাডভেঞ্চারে যোগ দিই। আগে
খুলনা থেকে নিজের সাইকেল নিয়ে
যেতাম। এখন ছোটভাই আমানের
একাধিক উন্নতমানের সাইকেল থাকায়
খুলনা থেকে আর সাইকেল নিতে হয় না,
ঢাকা থেকে ওর একটা সাইকেল নিয়েই

বেরিয়ে পড়ি। এবার যখন শুনলাম মার্চ-
২০২৩ লং রাইডের রুট বকশীগঞ্জ-
লাউচাপড়া-গজলী-মধুটিলা-পানিহাটা-
দুর্গাপুর-বিরশিবি-নীলাট্টি হাদ-টেকেরঘাট-
বারেকের টিলা-শিমলু বাগান-সুনামগঞ্জ;
তখন এতে যোগ দেবার লোভ আর
সামলাতে পারিনি। রুটের অধিকাংশ পথই
ভারতের মেঘালয় রাজ্যের গারো পাহাড়ের
পাদদেশ দিয়ে বাংলাদেশের সীমান্ত ধরে।
মার্চের ২ তারিখ রাতে ঢাকার পলাশী
থেকে সাইকেল বাক্সবান্ডি করে বাসে
উত্তোলাম জামালপুরের বকশীগঞ্জের
উদ্দেশে। ফজর নামাজের সময় বকশীগঞ্জে
পৌঁছালাম। ওই অসময়েও আমাদেরকে
অভ্যর্থনা জানানোর জন্য সেখানে উপস্থিত
ছিলেন বকশীগঞ্জ সাইক্লিস্ট গ্রুপের ৬/৭
জন সদস্য। সাইক্লিস্টদের জন্য অন্য
সাইক্লিস্টের সহমর্মিতা এমনই। ভোরের
আলো ফুটলে বাসের ছাদ থেকে
সাইকেলের বাক্স নামিয়ে যে যার সাইকেল
সংযোজন করে ফেলালাম আধা ঘণ্টার
মধ্যে। সাইকেল বাক্সগুলোকে বাসে
তুকিয়ে দেয়া হলো যাতে ফেরার সময়
আবার ব্যবহার করা যায়।
সাইকেলের বাক্স ছাড়াও বাসের মধ্যে তাবু
ছিল যেগুলো পৌঁছে যাবে নীলাট্টি লেকের
পাড়ে যেখানে আমরা তাঁবুতে রাত
কাটাবো। নাস্তা করে যাত্রা শুরু করলাম
সকাল সাড়ে সাতটার দিকে। প্রথম গন্তব্য
লাউচাপড়া অবসর বিনোদন কেন্দ্র। এই
বিনোদন কেন্দ্রটি বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত
ঘেঁষা জামালপুর জেলার বকশীগঞ্জ
উপজেলায় অবস্থিত। অপূর্ব প্রাক্তিক
সৌন্দর্যের পদসর সাজিয়ে থাকা
লাউচাপড়ার পাহাড়, অরণ্য, লেক ও
আদিবাসীদের স্বতন্ত্র জীবনধারা দেশি-



বিদেশ পর্যটকদের আকর্ষণ করে। আমরা এখানে ঘণ্টাখানেক কাটালাম। এরপর ছোট-বড় টিলার ওপর দিয়ে সাইকেল চালিয়ে পৌঁছালাম পরবর্তী গন্তব্য গজনী অবকাশ কেন্দ্রে। এটি শেরপুর জেলার বিনাইগাটী উপজেলার কাংশা ইউনিয়নের গারো পাহাড়ের পদদেশে অবস্থিত। এটি প্রায় ৯০ একর এলাকাজুড়ে বিস্তৃত। গজনী অবকাশ কেন্দ্রে আছে সবজু গাছপালার সারি, লতাপাতার বিনয়স, ছোট-বড় টিলা, উপজাতীয়দের ঘরবাড়ি ইত্যাদি। কৃত্রিম লেকের শান্ত জলে নৌবিহারের জন্য রয়েছে সীমান্ত প্যান্ডেল বোট ও ময়ুরপঙ্গী নৌকা। এছাড়া আছে ৬৪ ফুট উচু সাইট ভিড় টাওয়ার, ঝুলন্ত সেতু, ক্যাবল কার ও জিপ লাইনিং রাইড। যেহেতু একদিনে আনেকগুলো গন্তব্যে যেতে হবে, তাই এখানেও ঘণ্টাখানেকের বেশি থাকা সম্ভব হলো না। সাইকেলের মধ্য ঘৰলো এবার মধুটিলা ইকোপার্কের দিকে। মধুটিলা ইকোপার্ক বাংলাদেশের শেরপুর জেলার নালিতাবাড়ী উপজেলার সীমান্তবর্তী এলাকায় অবস্থিত অন্যতম একটি পরিবেশ উদ্যান। এই পার্কের আয়তন ৩৮৩ একর। এখানে আছে সাইট ভিড় টাওয়ার, লেক, প্যান্ডেল বোট, স্টার বিজি, মিনি চিড়িয়াখানা, শিশুপার্ক, রেস্ট হাউসসহ বিভিন্ন স্থাপনা। এছাড়া আছে ওষধি ও সৌন্দর্যবর্ধক প্রজাতির গাছ, মৌসুমি ফলসহ বিভিন্ন বর্ণের গোলাপের বাগান। পার্কটিতে জীববৈচিত্র্য ও প্রাণীর সমাহারও চোখে পড়ার মতো। সেদিন ছিল জুমার দিন। তাই হ্যামোক টাঙ্গিয়ে এখানে খানিকটা বিশ্রাম নিয়ে পার্কের সামনের রেঞ্চেরায় খাবার খেয়ে সেখানকার মসজিদে জুমার নামাজ আদায় করলাম। পরের গন্তব্য বিজয়পুর লেক।

কখনও শালবনের ভেতর দিয়ে মাটির বাস্তা, কখনও ছোট নদীর ওপর থাকা বাঁশের সঁাঁকে, কখনও পিচচালা পথ, কখনও এবড়ো থেবড়ো ভাঙা রাস্তা পেরিয়ে যখন বিজয়পুরে পৌঁছালাম তখন রাত হয়ে গিয়েছে। তাই সবাই মিলে ঠিক করলাম যে এখানে পরের দিন সকালে আসব। এটা পেরিয়ে তাই চলে গেলাম আমাদের সেদিনের রাতে থাকার স্থান নেত্রকোনার বিরিশিরি YMCA গেস্ট হাউস। সারাদিনে অসমতল পথে ১১০ কি.মি সাইকেল চালানোর পরিশ্রম তো ছিলই, গেস্ট হাউসের রান্নাটাও হয়েছিল অসাধারণ, তাই খাবার পর বিছানায় পিঠ এলিয়ে দিতে না দিতেই চলে গেলাম গভীর ঘুমে। পরের দিন ফজরের নামাজ পড়েই গেলাম দুর্গাপুর চীনামাটির পাহাড় ও বিজয়পুর লেক দেখতে। গোলাপি, হলদু, বেগুনি, খয়েরি, নীলাভ বিভিন্ন রংয়ের মাটির পাহাড় চোখ জুড়িয়ে দেয়। এছাড়া পাহাড়ের গা যেঁয়ে রয়েছে সবজু ও নীল পানির লেক। সকাল ১০টার দিকে যাত্রা করলাম। পরের গন্তব্য সুনামগঞ্জের নিলাটি লেকের দিকে।

নিলাটি লেক যাবার পথে একটা নদীতে গোসল করে দুপুরের খাবার খেলাম একটা ছোট দোকানে। বিকালের দিকে পেলাম টাঙ্গুয়ার হাওড়। হাওড়টি এখন শুকনো হলেও তাতে ফলে থাকা শয়ারাজি চমৎকার দশ্যুপট তৈরি করেছে। নিলাটি লেকে পৌঁছাতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। এদিন প্রায় ৭০ কি.মি চালিয়েছি। চন্দ্রালোকিত রাতে মেঘালয় প্রদেশের মেঘালয় পাহাড়ের পাদদেশে নিলাটি লেকের সৌন্দর্য বর্ণনাতীত। সন্ধ্যা থেকে রাত পর্যন্ত লেকের পাড়েই কাটিয়ে দিলাম।

নিলাটি লেক সুনামগঞ্জের একটি অন্যতম পর্যটন স্থান। এটি মূলত চুনাপাথরের খনির পরিত্যক্ত লেক। এর অবস্থান সুনামগঞ্জের তাহিরপুর উপজেলায় মেঘালয়ের সীমান্তবর্তী টেকেরঘাট গ্রামে। নিলাটি



লেকের প্রকৃত নাম শহীদ সিরাজ লেক। তবে পর্যটকদের কাছে এটি নিলাটি লেক নামে বেশি পরিচিত। আর স্থানীয়দের কাছে এর নাম টেকেরঘাট পাথর কোয়ারি। ঘন নীল পানির এই লেকের একপাশে মেঘালয়ের পাহাড়, তার চারপাশে ছড়ানো ছিটানো পাথর। অনেকে একে বাংলার কাশীর নামে অভিহিত করে থাকেন। এখানে রাত কাটালাম তাঁবুতে।

পরের দিনের গন্তব্য যাদকুটা নদীর পাড়ে বারেকের টিলা ও তাহিরপুরের শিমলু বাগান। বেশ উঁচু বারেকের টিলায় সাইকেল ঠেলে উঠতে বেশ পরিশ্রমই করতে হলো। কিন্তু সেখান থেকে যাদকুটা নদীর দশ্য দেখে সব কষ্ট ভুলে গেলাম। অনেক মানবকে দেখলাম সীমান্তের ওপার থেকে ভেসে

আসা পাথর ও কয়লা সংগ্রহ করতে। যাদকুটা নদীতে নেমে গোসল করলাম। পাহাড় বেয়ে আসা শীতল পানি সব ক্লান্তি ধূয়ে মুছে নিয়ে গেল। তাহিরপুরের শিমলু বাগানে যেতে যেতে দুপুর হয়ে গেল। গাছগুলোতে তখনও কিছু ফুল অবরুদ্ধ ছিল। বিকালে সুনামগঞ্জ বাসস্ট্যান্ডের দিকে যাত্রা করলাম; যেখানে আমাদের বাস আমাদের জন্য অপেক্ষা করে আছে। এদিন চালানো হয়েছে প্রায় ৬০ কি.মির মতো, তিনিদিন মিলে মোট ২৪০ কি.মি। তিনিদিন হিসাবে দূরত্ব বেশি নয়, কিন্তু যে অপার্থিব সৌন্দর্য আর সহসাইক্লিস্টদের সাথে যে আনন্দ উপভোগ করেছি তা তুলনাহীন।

লেখক: অধ্যাপক, কল্পিটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় ◆

গ্রুপ সাইকেলিংয়ে লং রাইডের খুঁটিনাটি

অ্যাডভেঞ্চুর

■ মো. আমানুর রহমান

নানাবিধি কারণে আমরা সাইকেল চালাই। যেমন-সুস্থিতের জন্য, মানসিক স্থায়কে ভালো রাখতে, দূরবর্তী এলাকায় যেতে; আপনাকে গাড়ি ভাড়া করতে হবে না এবং আপনি দূরবর্তী এলাকাগুলি ঘুরতে পারেন যেখানে গাড়ি দিয়ে স্থল নাও হতে পারে। আরও কত কি, কলেবর বাড়িবে বলে লিখছি না আর।

আমাদের আশপাশে হাজার হাজার লোক সাইকেল চালাচ্ছেন। এদের শতকরা ৯৫ জনই আসলে কম্যুট কারার জন্য চালান, মানে হলো বাসা থেকে অফিস বা বাজার বা স্টান্ডের স্কুল। পর্যটনের জন্য সাইকেল চালান কতজন? আমার মনে হয় না আমাদের দেশে এই ২০২৩ সালে সচল সাইকেল পর্যটকের সংখ্যা সব মিলিয়ে ২০০ জনের বেশি। আসলে ইচ্ছে থাকলেও অনেকে নানান পারিপার্শ্বিকতায় আর সাইকেল পর্যটক হয়ে উঠতে পারেন না।

ধরুন, আপনি কুয়াকটায় সাইকেল চালাতে চান কিন্তু আপনার নিরাস ঢাকায়। একভাবে আপনি যেতে পারেন, ঢাকা থেকে টানা পদ্মা পাড়ি দিয়ে ৩০০ কি.মি চালিয়ে কুয়াকটা গেলেন অথবা আরেকভাবে পারেন, ঢাকা থেকে পটুয়াখালী লক্ষ্ম গেলেন, ওখান থেকে চালালেন, তাতে ৭০ কি.মি চালানো হবে।

আর আপনি গড় পড়তা ১০০ কি.মি হয়তো চালাতে পারেনও কিন্তু মনে করছেন ৩০০ কি.মি আপনার জন্য অস্ত্রণ। এখন এই যে লক্ষ্মে সাইকেল নেবার প্রক্রিয়া কি আপনার জন্ম।

আবার ধরুন, আপনি শ্রীমঙ্গলে চা বাগানের নিসর্গে সাইকেল চালাতে চান কিন্তু ঢাকা থেকে চালিয়ে শ্রীমঙ্গল আপনার পক্ষে চালিয়ে যাওয়া স্থল নয়, তাহলে উপায়? উপায় গাড়িতে করে সাইকেল শ্রীমঙ্গল নিয়ে যাওয়া তারপর সেখানে চালানো।

গাড়িতে নিয়ে যাওয়া কি সহজ কোনো কাজ?

সাইকেলের পার্টস খুলে বক্স করো, তা না হয় ঢাকায় কোনো মেকানিক করে দিল, কিন্তু গন্তব্যে পৌছে

আবার সেই পার্টস জোড়া দিয়ে পুনরায় সাকেল
বানানো, না



জানলে কম ঝামেলার ব্যাপার না।

সাইকেল খোলা, লাগানো, পরিবহণ এসব কাজে একা নানান বাকি আর খরচে ব্যাপার। তাহলে আমরা যারা ঘুরছি কীভাবে ঘুরছি? সেটা বলার জন্যই আজকের লেখা। সাইকেল চালানোর জন্য নানান গ্রুপ আছে। অধিকাংশই ফেসবুকভিত্তিক গ্রুপ। বিডি সাইক্লিস্টের নাম হয়তো অনেকেরই জানা। এমনি নানান সাইক্লিং গ্রুপ আছে, তাদের মধ্যে বহুল পরিচিত কয়েকটা যেমন হেমন্ত সাইক্লিস্ট, এসডিসি, হলিডে, সাইক্লিস্ট, খুলনা সাইক্লিস্ট আরও কত নাম যে আছে। এদের সিংভাগ ঢাকাভিত্তিক। তবে ঢাকার বাইরে এলাকাভিত্তিক নানান গ্রুপও এখন সক্রিয়। এসব গ্রুপ কেউ নিয়মিত আবার কেউ অনিয়মিত দূর দূরাতে রাইড পরিচালনা করে। ওদের সাথে ট্যাগ থাকলেই ব্যস কোনো গন্তব্য আপনার পছন্দ হলে চলে যেতে পারবেন। প্রতিটা গ্রুপেই আছে নিরলস স্থেচ্যুশিমিক, তারাই আপনাকে সাহায্য করবে সব কিছু শিখে নিতে। গ্রুপগুলোর মধ্যে হেমন্ত সাইক্লিস্ট ঢাকার বাইরে নিয়মিত আর সবচেয়ে বেশি রাইড পরিচালনা করে থাকে। গড়ে প্রতিমাসে হেমন্ত সাইক্লিস্টের একটা লং রাইড থাকে। ইতোমধ্যে তাদের ৬১টি এমন লং রাইড হয়ে গেছে। এমনকি তারা দেশের বাইরেও রাইড পরিচালনা করে থাকে। আগ্রাহী যে কেউ হেমন্ত সাইক্লিস্টের ফেসবুক গ্রুপে নিজেকে অ্যাড করে নিতে পারেন।

লং রাইড #৬২ যাবে উত্তরবঙ্গে আগামী মে মাসে। সেটা কয়দিনের ট্যুর, আনন্দানিক

খরচ, কুট ইত্যাদি ফেসবুক গ্রুপের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়। এখন হাজার হাজার মেঘার সবাই তো আর যাবে না, আগ্রাহী যারা তাদের নিয়ে একটা আলাদা ফেসবুক গ্রুপ খোলা হয়। সাধারণত এসব রাইড ছুটির দিনগুলিতে নন-এসি বাসে করা হয়। ধরা যাক, যাবার দিন ২ মে বৃহস্পতিবার রাত ৯টায় পলাশী থেকে রওনা হয়ে রংপুর শুক্রবার সকাল ৮টায় পৌছানোর টার্গেট কুটে চালানোর পরিকল্পনা। তাহলে সবাই বৃহস্পতিবার সক্রা ষ্টার মধ্যে সাইকেল নিয়ে হাজির হবে। স্পষ্টে সাইকেলের বক্স রাখা থাকবে। সামনের ঢাকা, স্যাডেল, হাডেলবার আর প্যাডেল খুলে পুরো সাইকেল বক্সবন্দি করা হবে। আপনি নিজে পারলে ভাল, না পারলেও সমস্যা নেই, যিনি পারেন তিনি আপনাকে দেখিয়ে দেবেন একদম বিনা পারিশ্রমিকে, অবশ্য এর বিনিময়ে আপনি এক কাপ চা খাওয়াতে নিশ্চয়ই মাইন্ড করবেন না। এভাবেই একটা পর একটা বক্স হতে থাকবে। সাধারণত এক গাড়িতে ৩৬ জনের বাবস্থা হয়। তাতে ৩০টি সাইকেল বক্স করে ছাদে দেওয়া হয় আর বাকি ছয়টা সাইকেল বক্স ছাড়া পেছনের সিটে রাখা হয়। বক্সগুলো ছাদে উত্তোলের সময় নিজেরা নিজেরাই স্থেচ্যুশমে উঠিয়ে আবার কাজ শেষে ত্রিপল দিয়ে ঢেয়া হয় যাতে বৃষ্টি বা কুয়াশায় ভিজে না যায়। একটা সাইকেল এভাবে বক্স করতে সর্বোচ্চ ১৫ থেকে ২০ মিনিট লাগবে। এরপর হইচ্ছাড় করতে করতে পিকনিক আমেজে আপনার সাইকেল সমেত গাড়ি ছেড়ে দিল। আপনি ফিরে গেলেন আপনার সেই কৈশোর তারকণের দিনগুলিতে। পথে কোথাও সবাই মিলে যাব যেমন



সামর্থ্য থেয়ে নিলেন। এরপর লঞ্চ ঘূম, পরদিনের জন্য শক্তি সঞ্চয়। মহান আল্লাহর কৃপায় সকালেই পোছে গেলেন রংপুর। সবাই মিলে বক্স ছাদ থেকে নামিয়ে সাইকেল আবার জোড়াতালি দিতে হবে। কাল কিন্তু আপনি নভিস ছিলেন, আজ দেখা যাবে আপনি ৯০ ভাগ কাজ নিজেই পারছেন বাকিটা হয়তো কারো সাহায্য লাগবে। সবার সাইকেল চালানোর জন্য রেডি। খালি বক্সগুলো আবার বাসে স্যাত্তে তুলে রেখে সকালের নাস্তা সেবে সেই মহেন্দ্রক্ষণের অপেক্ষা। উত্তরবঙ্গে যে আমার প্যাটেলের আগে চলেনি। এ যেন কলম্বাসের আমেরিকা আবিস্কারের মতো কিংবা প্রথমবার সমন্বয় বা পাহাড় দেখার মতোই অনুভূতি।

রাইড লিডার সবাইকে ডেকে নির্দেশনা দিলেন কোন পথে কোথায় আমরা যাব, কোথায় ব্রেক নেব আর রাতটাই বা কোথায় কাটাবো। ধরা যাক, লালমনি-নরহাটে রাত্রিবাস।

তাহলে সবাই মিলে রংপুর থেকে লালমনি-নরহাটের পথে এক লাইনে শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়ে রাইড লিডারের নেতৃত্বে চালানো শুরু হবে। রাতে আগেই ফিক্সড করা লালমনি-নরহাটে কোনো সাশ্রয়ী হোটেলে সবাই মিলে থাক। এরপর খাওয়া দাওয়া আভ্যন্তরীণ।

পরদিনের টার্গেট ধরা যাক পঞ্চগড়। তাহলে বাস চলে যাবে পঞ্চগড় আমাদের ঢাকা ফেরত আনার জন্য।

আমরাও সবাই লালমনি-নরহাট থেকে নির্ধারিত পথে সবাই মিলে পঞ্চগড় চলে যাব। রোববার সবার অফিস ধরার তাড়া। তাই শুরুর মতো শেষের যাত্রায় কোনো টিলেমি থাকে না। সাথে দুদিন টানা সাইকেল চালানোয় সবাই ক্লান্ত। সবাই মিলে আবার সাইকেল বক্সিং আবার যথারীতি সকালে পলাশী

নেমে আনবক্সিং, এরপর সবাই যার যার মতো আপন নীড়ে ফেরায় বাস্ত।

পেছনে পড়ে থাকে দারুণ সব

সুখসূচি। কয়েকদিন চলে

ফেসবুকে পেস্ট আর

মেসেঞ্জার এক্সেপ কথার

ফুলবুরি। এভাবে

কয়েকটা রাইড দিলে

তখন দেখবেন এরাই

আপনার সবচেয়ে কাছের

বন্ধু। বট ছেলেমেয়ে সব

পর! আর সন্দেহের দৃষ্টিতে

অন্যরা তাকায়, বুড়ো বয়সে

লোকটাকে কি ভীমরতিতে

ধরল! আসল কথাই তো বলা

হয় নাই। খাওয়া দাওয়া বাদে

আসা যাওয়া থাকা

মোট খরচ



২৫০০ টাকার মধ্যেই থাকবে আশা করা যায়, সাথে আনন্দ থাকবে লাখ টাকার। একবার ভাবুন তো, সাইকেল ছাড়া ২৫০০ টাকায় পারবেন চার পাঁচটা জেলা ভ্রমণ করতে? উত্তর আমি দিয়ে দিই- অসম্ভব, সাথে আনন্দ থাকবে অফুরন্ট... যা টাকার মানদণ্ডে মূল্যায়ন করা অসম্ভব। নারীরা ভুল বুবাবেন না, আপনাদের জন্যও ব্যবস্থা আছে। আমাদের সাথে অনেকে সময়েই নারী সাইকেলিংরাও থাকেন। তাদের যথাযথ নিরাপত্তার ব্যবস্থা সবাই মিলেই করা হয়। সবকিছু সামলে নেয়া শুরুতে একটু কঠিন, আগাম কিছু প্রস্তরির দরকার হয়।

গ্রুপ সাইকিং ভ্রমণে কিছু টিপস

- ❖ পরিবারকে সময় দিন,
কোথাও ঘুরতে নিয়ে যান,
যাতে ওই সময়

বাগড়া না দেয়।

❖ টুকটাক সাইকেল মেরামতের কাজ শিখে
কেলেন।

❖ ধীরে ধীরে নিজের সক্ষমতা বাড়ান, গতিতে ও
দূরত্বে। এখন যদি ১৮ কি.মি প্রতিঘণ্টা গতিতে ৩০
কি.মি যেতে পারেন, চেষ্টা করল দুই মাসে ২০ কি.মি

প্রতিঘণ্টা গতিতে ৫০ কি.মি যেতে।

❖ ভালো সঙ্গী নির্বাচন করলন। তার সাথে সময়ে

অসময়ে বের হয়ে যান আশপাশে।

❖ শুক্রবারের গ্রুপ রাইড মিস করবেন না।

❖ যেখানে যাচ্ছেন সে এলাকা সমন্বে কিছু ধারণা

নিয়ে নিন।

❖ অবশ্যই হেলমেট আর ঘাভস পরুন।

লেখক: ভাইস প্রেসিডেন্ট, ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড ◆



কেমন হবে ঈদের খাবার

■ পর্যটন বিচিত্রা ডেস্ক

এক মাস রোজা ও ঈদের দিন অনেক খাওয়া-দাওয়া সব মিলিয়ে ঈদের পর অনেককেই নানা রকম অসুখ বা শারীরিক জটিলতায় ভুগতে দেখা যায়। এক মাস রোজায় অনেকেই ওজন বাঢ়িয়ে ফেলে। আবার অনেককেই অপর্যাঙ্গ অস্থান্তর খাবার ক্রমাগত খাওয়ার ফলে এসিডিক বা গ্যাসজনিত সমস্যায় পড়তে দেখা যায়। রোজার মাসে অনেক আজাপোড়া খাবার খাওয়া, অতিরিক্ত মিষ্টি বা চিনির শরবত গ্রহণ করার ফলে অনেককেই দেখা যায় রক্তের চর্বির মাঝা বেড়ে যায়। আবার অনেকেই ডায়াবেটিসের ঝুঁকিতে চলে আসে। রোজা ও ঈদের পর স্বাস্থ্য যত্ন অনেক জরুরি। সুস্থ থাকার জন্য সবারই উচিত স্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়ার মধ্য দিয়ে ঈদ উদয়পন করা। তাই ঈদের মেন্যুতে সবারই উচিত পুষ্টি ও স্বাদের সমন্বয় করা।

সকালের খাবার

ঈদের দিন সকালে হালকা খাবার থান। পাতলা তেল ছাড়া পরোটা বা রটির সঙ্গে একটু ভিজ্ব স্বাদের সবজি, যেমন-সবজির কোরামা বা দম বা নিরামিষ খেতে পারেন। ঈদে সারা দিন অনেক রকম প্রোটিনজাতীয় খাবার খাওয়া হয়, তাই কেউ চাইলে সকালের খাবারে প্রোটিন এড়িয়ে যেতে পারেন। সকালের নাশতায় একটা ফল থাকলে ভালো হয়। কেননা, সারা দিন বেড়ানোর পর হয়তো দৈনিক ফলের চাহিদা নাও পূরণ হতে পারে। তাই সকালে ফল খেয়ে নেওয়া ভালো।

দুপুরের খাবার

ঈদের দিন দুপুরে পোলাও বা হালকা মসলার খিচড়ি থাকতে পারে মেন্যুতে। সেইসঙ্গে মাছের কোনো রেসিপি ও সবজি থাকলে ভালো। টক দই, সবজির সালাদ আপনাকে হজমে সাহায্য করবে। তাই সালাদ রাখবেন ঈদের দুপুরের মেন্যুতে।

রাতের খাবার

কেউ যদি মনে করেন, রাতে ভালো খাবার থাবেন, সে ক্ষেত্রে মাছ বা মাংসের ভিন্নধর্মী রান্নার সঙ্গে ভাত খেলেও মেন্যুটা অনেক স্বাস্থ্যকর হবে। ঈদের রাতে দাওয়াতে গেলেও ভালো খাবার, আবার বাড়িতে থাকলেও ভালো খাবার। তাই রাতের খাবারের মেন্যু একটু ভিন্নভাবে করলে ভালো। যেমন-মাংসের কোনো রেসিপি ঈদের রাতের মেন্যুতে থাকতে পারে। সেইসঙ্গে পোলাও বা অল্প তেলের বিরিয়ানি থাকতে পারে।

মিষ্টান্ন

ঈদের মিষ্টান্ন খাবার সবার কাছেই খুব প্রিয়। ঘরে তৈরি মিষ্টান্ন স্বাদ ও পুষ্টিকর হয়ে থাকে। দুধের মিষ্টান্ন অনেক স্বাস্থ্যকর। তাই ঈদের মিষ্টি দুধের তৈরি হলে সোটি থেকে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস পাওয়া যায়। সেইসঙ্গে প্রচুর প্রোটিনও চলে আসে। তবে চিনির সিরার মিষ্টি এড়িয়ে চলা ভালো। তবে রোগীদের ক্ষেত্রে যেকোনো খাবারই বুরোগুণে খাওয়া ভালো।

আসন জেনে নিই ঈদের দিনের কয়েকটি খাবারের রেসিপি



আস্ত মুরগি রোস্ট

ঈদের দিন বাড়িতে রোস্ট বানান অনেকে। তবে আস্ত মুরগি রোস্ট করা নিয়ে মন থাকে খুঁতখুঁতে। ভেতরে ঠিকমতো মসলা ঢুককে তো? তাদের জন্য এই রেসিপি দেয়া হলো।

উপকরণ

মাঝারি আকারের মুরগি ১টি, আদাবাটা ১ চা-চামচ, রসুনবাটা ২ চা-চামচ, পেঁয়াজবাটা ১ টেবিল চামচ, রোজমেরি ১ চা-চামচ, থাইম ১ চা-চামচ, গোলমরিচের গুঁড় ১ চা-চামচ, পাপরিকা ২ চা-চামচ, শুকনা মরিচগুঁড়া আধা চা-চামচ, লবণ পরিমাণমতো, সয়া সস ১ টেবিল চামচ, বারবিকিউ সস ১ টেবিল চামচ, অয়েস্টার

সস ১ টেবিল চামচ, টমেটো সস ৩ টেবিল চামচ, লেবুর রস ১ টেবিল চামচ ও অলিভ অয়েল ২ টেবিল চামচ।

প্রণালি

কাঁটা চামচ দিয়ে মুরগির মাংস অল্প কেচে নিন। কাচা মাংসে সব উপকরণ ভালোমতো একসঙ্গে মিশিয়ে দই-তিন ঘটা রেখে দিন। মুরগি অ্যালুমিনিয়াম ফয়েলে পেঁচিয়ে প্রিহিটেড ওভেনে ২২০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপে ৪০-৪৫ মিনিট বেক করুন। প্যানে ১ টেবিল চামচ মাখন গরম করে মুরগির মসলা মাখানো বোল ও মুরগি দিয়ে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে পছন্দমতো সার্জিয়ে পরিবেশন করুন।





ভুনা গরুর মাংস

খব সহজে রান্না করতে জেনে নিন, কী
কী উপকরণ লাগবে এই রেসিপিতে
এবং কীভাবে তৈরি করবেন গরুর
মাংসের এই আইটেম।

উপকরণ

হাড়চাড়া গরুর মাংস এক কেজি, শুকনা মরিচ ছয়টি, পাঁচফোড়ন
এক চা চামচ, এলাচ চারটি, দারচিনি তিন টুকরা, ঝড়ি করা আদা
এক টেবিল চামচ, রসুন চার কেষ, তেজপাতা একটি, গোলমরিচ
২০টি, লবঙ্গ দুটি, পেঁয়াজ বেরেস্তা এক কাপ, তেল আধা কাপ,
চিনি সামান্য পরিমাণ এবং লবণ স্বাদমতো।

প্রস্তুত প্রণালী

থথমে সব মসলা গুঁড়ো করে
নিন। এরপর ঘেঁতলানো
গরুর মাংস কড়াইয়ে দিয়ে
এতে একে একে তেল,
আদা-রসুন ভাজা গুঁড়া,
পাঁচফোড়ন গুঁড়া, তেজপাতা
গুঁড়া, মরিচ গুঁড়া ও লবণ
দিয়ে একটু ভেজে নিন।
এরপর এর মধ্যে বেরেস্তা
দিয়ে একটু নেড়ে এতে গরম
পানি দিয়ে আবারও নেড়ে
২০ মিনিটের জন্য ঢাকনা
দিয়ে ঢেকে দিন। ২০ মিনিট
পর ঢাকনা তুলে এতে
সামান্য চিনি দিন। এরপর
সেক্ষে হয়ে গেলে আরেকটু
নেড়ে পরিবেশনপাত্রে
নামিয়ে নিন। এবার পেঁয়াজ
বেরেস্তা, শসা এবং কাঁচা
পেঁয়াজ দিয়ে সাজিয়ে
পরিবেশন করুন মজাদার
ভুনা গরুর মাংস।

মুরগির ভুনা খিচুড়ি

ঈদের দিন দুপুরের পর বাসায় বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনরা বেড়াতে আসেন।
তাদের জন্য রান্না করতে পারেন মুরগির ভুনা খিচুড়ি।

উপকরণ

মাংসের জন্য: মুরগির মাংস ১ কেজি, চিনাবাদাম বাটা
৪ চা চামচ, দারচিনি ৪ টুকরা, আদা বাটা ১ টেবিল
চামচ, রসুন বাটা দেড় টেবিল চামচ, ধনিয়া ১ চা
চামচ, জিরা ১ চা চামচ, কাঁচা মরিচ বাটা ৩ টেবিল
চামচ, টমেটো সস ২ টেবিল চামচ, টক দই আধা

কাপ, চিনি ১ চা চামচ, লবণ স্বাদমতো, তেল ১ কাপ।
খিচুড়ির জন্য: চাল ১ কেজি, হলুদ গুঁড়া আধা চা
চামচ, পেঁয়াজ কুচি ১ কাপ, মরিচ ফালি ৪-৫টি,
আদা-রসুন বাটা ১ চা চামচ, এলাচ ৪/৫টি, লবঙ্গ ৫-
৬টি, দারচিনি ২ খণ্ড, তেজপাতা ২টি, তেল
পরিমাণমতো, গরম পানি পরিমাণ মতো।



যেভাবে তৈরি করবেন

- * মুরগির মাংস কেটে ধুয়ে নিয়ে একটি বড়
পাত্রে মাংসের জন্য রাখা সব কিছু দিয়ে
মিশিয়ে মেরিনেট করে রাখুন ৩০ মিনিট।
- * একটি পানে সামান্য তেল গরম করে
এতে আধা কাপ পেঁয়াজ কুচি দিয়ে নরম
করে ভেজে এতে মেরিনেট করা মাংস
দিয়ে দিন। রান্না করতে থাকুন মাংস সিন্ধ
না হওয়া পর্যন্ত। প্রয়োজনে সামান্য পানি
দিতে পারেন। মাংস সিন্ধ হয়ে মাথা মাথা
হলে নামিয়ে রাখুন।
- * একটি বড় প্যানে তেল দিয়ে গরম করে
নিন। এতে দিয়ে দিন বাকি পেঁয়াজ কুচি।
নরম হয়ে এলে আদা-রসুন বাটা দিয়ে
নেড়ে দিন।
- * এরপর গরম মসলা ও হলুদ দিন। মসলা
একটু ভেজে নিয়ে এতে দিন ধুয়ে রাখা
চাল। চাল ভালো করে নেড়ে কষাতে
থাকুন।
- * চাল ভালো করে কষানো হলে এতে গরম
পানি দিন।
- * চাল প্রায় সিন্ধ হয়ে এলে রান্না করা
মুরগির মাংস এতে দিয়ে ভালো করে নেড়ে
মিশিয়ে নিন।
- * ঢেকে দিয়ে আরো ১০ মিনিট অল্প আঁচে
রাখুন। এবার লবণের স্বাদ বুঝে নিয়ে রান্না
ঠিকমতো হলে চুলা থেকে নামিয়ে নিন।
- * এবার ওপরে বেরেস্তা, ধনেপাতা কুচি
ছিটিয়ে গরম গরম পরিবেশন করুন। ◆

কাশীরের ১৬ রকম 'কাওয়াহ চা'

■ পর্যটন বিচিত্রা ডেক্স

ভূষিত কাশীরের বাসিন্দা মোস্তাক হোসাইন আখন। পেশায় তিনি শিকারাচালক। স্থানীয় লোকেরা তাকে 'কাওয়াহ ম্যান' নামেই চেনেন। কারণ লোকের পানিতে শিকারা চড়ার সঙ্গে অতিথিদের ১৬ রকম 'কাওয়াহ চা' আপ্যায়ন করান। গত ৯ বছর ধরে ডাল লোকের পানিতে ভেসে থাকা স্থানীয় সজি বিক্রেতা থেকে শুরু করে পর্যটিক সকলকেই এই চা দিয়ে থাকেন তিনি।

কাশীরি কাওয়াহ চা কাশীরের উপত্যকার ভালোবাসা ও আতিথেয়তার প্রতীক। বিশেষ এই চা খাওয়ার আনন্দই আলাদা। শরীরে প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে তুলতে বিশেষ এই চায়ের ভূমিকা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। ত্বকের স্বাস্থ্য, হার্ট, হজমের সমস্যা দূর করতে পারে এই চা।

এ ছাড়াও অ্যান্টি-অক্সিড্যাণ্টে ভরপূর কাওয়াহ শরীরকে ডিটক্সিফাই করতে সাহায্য করে। কাশীরের এই বিশেষ চা তৈরি করতে ১৬টি উপাদান ব্যবহার করেন মোস্তাক। চায়ের মধ্যে কাঠবাদাম, আখরোট, কাজুবাদাম, খেজুর, গোলাপ ফুলের পাপড়ি, মধু, জাফরান, ছেট এলাচ, দারচিনি, আদাৰ মতো উপাদান দিয়ে তৈরি হয় কাশীরি কাওয়াহ।

মোস্তাকের ভাষ্য, কাশীরি ঘুরতে আসা পর্যটকরা যখন থার শিকারায় ঢেকে ডাল লেকে ঘুরতেন, তখন তিনি তাদের এই চা পরিবেশন করতেন। তার শিকারায় উঠে এক কাপ কাওয়াহ খেতে গেলে খরচ



করতে হবে ৫০ টাকা।

২০১৪ সাল থেকে এই বিশেষ চায়ে নিজের দক্ষতার ছাপ রেখে চলেছেন মোস্তাক। বর্তমানে তার কাছে

প্রায় ১৬ রকম কাশীরি কাওয়াহ চা পাওয়া যায়। এ ছাড়া তার শিকারায় উঠলে পর্যটকরা কিনতে পারবেন সেখানকার বিখ্যাত সব সুগন্ধি মশলা। ◆

ইজিপ্ট এয়ারের ঢাকা-কায়রো ফ্লাইট শুরু ১৪ মে

■ পর্যটন বিচিত্রা ডেক্স

মিশরের রাষ্ট্রীয় পাতাকাবাহী উড়োজাহাজ সংস্থা ইজিপ্ট এয়ারের ঢাকা-কায়রোতে সরাসরি ফ্লাইট শুরু করতে যাচ্ছে আগামী ১৪ মে থেকে।

সঙ্গে প্রতি রোবাবার ও বুধবার এ উড়োজাহাজ সংস্থাটির ফ্লাইট ঢাকা থেকে কায়রোর উদ্দেশে ছেড়ে যাবে।

বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (বেবিচক) সুত্রে এসব তথ্য জানা যায়।

বেবিচকের সহকারী পরিচালক (এয়ার ট্রাঙ্গোট) মো. ওয়াহিদুজ্জামানের স্বাক্ষর করা গত ২৯ মার্চে এক চিঠিতে বলা হয়েছে, ইজিপ্ট এয়ার বেবিচক কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে ফ্লাইট পরিচালনা করার অনুমতি পেয়েছে।

ইজিপ্ট এয়ার কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, ঢাকা থেকে কায়রোতে ফ্লাইট পরিচালনা করার জন্য বোয়িং ৭৮৭-৯ মডেলের উড়োজাহাজ ব্যবহার করবে ইজিপ্ট এয়ার।

প্রাথমিকভাবে সঙ্গে দুটি ফ্লাইট চলবে। পরবর্তীতে



চাহিদা ও পরিস্থিতি অনুযায়ী ফ্লাইটের সংখ্যা বাড়ানো হবে।

ভূগোলিক তথ্যভান্দার সেবার মার্কেট ইন্ডেলিজেন্সের হিসাব অনুযায়ী, ২০১৯ সালে বাংলাদেশ থেকে মিশরের আকাশপথে ১৭ হাজার

৩২০ জন যাত্রী যাতায়াত করেছেন। এসব যাত্রীর ৭৫ শতাংশকে কায়রোর পরিবর্তে প্রথমে অন্য শহরে অবতরণ করতে হয়েছে। ঢাকা থেকে কায়রোতে সরাসরি ফ্লাইট না থাকায় দুবাই, শারজাহ বা জেদ্দা হয়ে কায়রোতে যেতে হয়। ◆



COLORFUL HILL TRACTS

Bandarban | Rangamati | Khagrachari

Explore:

Khagrachari-Sajek (3D-2N)
Rangamati-Kaptai Lake (3D-2N)
Bandarban-Nilgiri (3D-2N)

Experience

**Authentic Tribal Culture, Food,
Crafts & Festival**



Please contact
for more details



RIVER AND GREEN TOURS

House-97/1, Flat-2B, Shukrabad, Dhannondi, Dhaka-1207
E-mail: rgtour@gmail.com, info@riverandgreen.com
www.riverandgreen.com

+88 01819224593
+88 01730450099

পাহাড়ে র্যাপলিংয়ের রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা

টাইমেন্ট্রান্সলেন্স

■ নাদিয়া ইসলাম নিতুল

Life is a highway the journey begins till the end. আমাদের যাপিত জীবনে আমাদের মনস্তুক শুন্দি একটা গভীরে আটকে রাখে, সেই বাক্সে বন্দি একগুচ্ছে মৃত্যু থেকে বের হয়ে নতুন শুরুটা তখনই স্বতন্ত্র আমরা বের হই 'নিজেকে জানার অভিযানে'। নিজের ভেতরের অসীম শক্তিকে তখনই অনুধাবন করা যায় যখন প্রতিকূল পরিস্থিতির সম্মুখীন হই আমরা, নিজেকে জয় করার অভিযানটা সেখান থেকেই শুরু হয়। তখন আমরা হয়ে যাই অভিযানী। ভ্রমণ মানে আমার কাছে নিজেকে জানার অভিযান। রহস্য রোমাঞ্চ ভালোবাসার বিষয়টা মনে হয় ছোটবেলা থেকে অ্যাডভেঞ্চার বই পড়া, মুভি দেখা, স্কুলের গভীরে থাকার সময় গার্লস গাইড করার কল্যাণে শুরু। মেডিকেল কলেজের স্টাফ ট্যুরে দার্জিলিং গিয়ে কাঞ্চনজঙ্ঘার সুর্যোদয় দেখে প্রথম পাহাড়ের প্রেমে পড়েছিলাম। এফএম রেডিওতে কাজ করছি সেই ২০১১ সাল থেকে। কখনো স্টেশন থেকে ছুটি যদি নিতাম সেটার একটাই উদ্দেশ্য দূরে কোথাও ঘুরতে যাবো। সবচেয়ে প্রিয় অবশ্যই পাহাড়। পাহাড় একটা নেশনের মতো যত যাবেন নেশা তত বাড়তেই থাকে। ট্র্যাকিং করেছি সীতাকুণ্ড, কিউকাডং, দামতুয়া, ধূপগানি, হামহাম, রেমাঞ্জি, রোয়াংছড়ি, খাগড়াছড়ি রাঙামাটি থেকে বাল্মীরবান, এক একটা প্রকৃতির বুনো সৌন্দর্য মন্তিক্ষের নিউরনে মেই সুখানুভূতি দেয় তা শব্দে বর্ণনা করা কঠিন। যে কখনো পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে তার বিশালতা অনুভব না করেছে তাকে বুঝিয়ে বলা সত্ত্ব না। ভ্রমণের প্রতি ভালোবাসা থেকেই এবিসি রেডিওতে ২০২০ থেকে শুরু করি 'হাইওয়ে টু ট্রাভেল' শো; যা আমাকে পরিচয় করায় দুঃসাহসিক সব পর্বতারোহী, ভ্রমণপ্রিয় মানুষ এবং অভিযানীদের সঙ্গে, ভ্রমণের নেশাটা আরও পেয়ে বসে আর খুঁটিনাটি বিষয় জানার আগ্রহ বেড়ে যায় অনেকগুলি। দুর্গমতা অনেক দেখেছি, পাহাড়ের ভয়ংকর সৌন্দর্যে মুক্ত হয়েছি বহুবার। তবে এবারের ভ্রমণটা ছিল অন্যরকম, একই সাথে ভ্রমণ আর রোমাঞ্চের সংমিশ্রণ। সারা বিশ্বে ক্লাইম্বিং অত্যন্ত জনপ্রিয় অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টস, যার রয়েছে অনেক বকম ধরে- লং ফেস র্যাপলিং (কন্ট্রুল ডিসেন্টি), জুমারিং, এক্সট্রিম হ্যামকিং, ক্যানোয়িং, জিপ লাইন, রিভার রুসিং। বাংলাদেশে অনেক আগে থেকেই এগুলো হয়। কিন্তু অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয় ভ্রমণবিলাসী



মানুষদের জন্য এই সুযোগটা করে দিয়েছে বাংলাদেশের অ্যাডভেঞ্চার একটিভিটি ক্লাব 'ওয়াইল্ডারনেস বিডি' ও 'জাঙ্গ ড্রিউ বিডি', যারা অত্যন্ত দক্ষতার সাথে ভ্রমণপিয়াসী মানুষদের নিয়ে এই ইভেন্ট করে আসছে। তাদের ইভেন্টে

অংশগ্রহণের মাধ্যমেই আমার অভিজ্ঞতা হলো জীবনে প্রথমবার র্যাপলিং করার। ১৪ তারিখ রাতে ফকিরাপুর থেকে শ্যামলী বাসে করে সীতাকুণ্ড চন্দনাথ পাহাড়ের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু। এই ট্রিপে যাওয়ার আগে ২৪ জন ভ্রমণসঙ্গীর কেউ

Ladybird
Holidays

sky is yours
www.ladybirdholidays.com

info@ladybirdholidays.com
www.ladybirdholidays.com
ladybirdholidays
ladybirdholidays

৯৭/১ শুক্রবাদ
ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৭

+৮৮ ০১৮৮৬৯৮৯৮

পরিচিত ছিল না। কাউন্ট্রারে গিয়ে তানভীরের সাথে পরিচয় হওয়ার পর জান্মাত, তারেক, হাবিব ভাই, ইজাজ, ইমু, রেখাসহ সবাই এতো আন্তরিক ছিল যে মনেই হয়নি আমাদের প্রথম পরিচয়। প্রায় রাত ১২টায় রওনা দিয়ে ভোর ৫টায় আমরা পৌছে যাই সীতাকুণ্ডে। সেখান থেকে আমাদের ইস্ট্রাক্টর সাদাৰ ইয়াসিৰ ভাইয়ের সাথে পরিচয়, যার ও ঘন্টার ট্রেনিং ও প্র্যাকটিস সেশন করেই ২৪ জন অভিযানী জীবনে প্রথমবার ৩০০ ফুট র্যাপলিং করার রোমাঞ্চ উপভোগ করে। ইভেন্টের নাম ছিল ৩০০ ফুট লং ফেস র্যাপলিং। চন্দ্রনাথ পাহাড় ১০২০ ফুট, ৭১১ ফুট উচ্চতায় রয়েছে বীরূপাক্ষ মন্দির। সেখানকার ক্লাইঞ্জিং পয়েন্ট থেকে ৩০০ ফুট খাড়া পাহাড় (৩০ তলা উচ্চতার বিল্ডিং) বেয়ে লং ফেস র্যাপলিং করায় ‘ক্রাঙ্ক ড্রিল্ট বিডি’ টিম। লং ফেস র্যাপলিংয়ের আরেক নাম কন্ট্রোল ডিসেন্টি। যেখানে মোট তিনটি ক্লাইঞ্জিং গিয়ার থাকে— কোমড়ে হারনেস, ক্যারাভেনোর, ফিগার অব এইট আৰ সেই সাথে স্টাটিক রোপ যার সাথে ফ্লাভস। খুবই টেকনিক্যাল ও অ্যাক্সেন্ট ফিজিঙের সুত্র মনেই এৰ প্ৰত্যেকটা ডিভাইস ব্যবহাৰ কৰা হয় এবং কাজ কৰে। বিশেষ নেটেৰ সাহায্যে হারনেসে সংযুক্ত ক্যারাভেনোৱেৰ সাথে ফিগার অব এইট এবং রোপ যুক্ত কৰে এই অ্যাক্সেন্টটি কৰা হয়। ক্রাঙ্ক ড্রিল্ট বিডিৰ ঝুৱা বার বার কৰে বলে দেয় চুল ও জামা খুব সাবধানে রাখতে। কাৰণ ক্যারাভেনোৱে এবং ফিগার অব এইটেৰ মধ্যে কোনোভাবে কিছু আটকে গেলে বিপন্নি হতে পাবে, তখন বুলন্ত অবস্থা থেকে রেসকিউ কৰা ছাড়া কিছু কৰার থাকে না, আৰ ডান হাত দিয়ে ডিসেন্ট কৰে নামাৰ সময় ক্যারাভেনোৱেৰ বাব বাব ঘষা খাওয়াৰ ফলে গৰম হয়ে যায় তাই সাবধান থাকতে হয়।

আমাৰ পলা শুৰু হওয়াৰ পৰ প্ৰথম দিকে বেশ কিছু গাছেৰ ডালগালাৰ ওপৰ দিয়ে ধীৱেৰ ধীৱেৰ র্যাপলিং কৰে নামতে শুৰু কৰি। প্ৰথমে বাব বাব ডালগালা পায়ে আটকাছিল। ভয় বিষয়টা একেবাৰেই ছিল না। ভেতৱে থেকে প্ৰচণ্ড এক রোমাঞ্চ অনুভব কৰিছিলাম। প্ৰথমে দুইবাৰ ব্যালেন্স রাখতে সমস্যা হচ্ছিল। কিন্তু কীভাৱে যেনে নিজেৰ ভেতৱেৰ আভাৱক্ষাৰ ক্ষমতা আমাৰ মষ্টিকে বলে দিছিল কীভাৱে প্ৰতিকূলতা থেকে বেৰ হতে হবে। প্ৰায় ৫০ ফুট নিচে আসাৰ পৰ নিচে থেকে অভি ভাই ভ্ৰেন নিয়ে আপেক্ষা কৰেছে ফুটেজ নেয়াৰ জন্য। উনি বললেন- ‘আপু হাত পা ছেড়ে রিল্যাক্স হয়ে পেছনে তাকান আৰ রোমাঞ্চ অনুভব কৰেন।’ ৩০ তলা সমান উচ্চতায় বুলন্ত অবস্থায় আশপাশে দেখাৰ সময় যে অ্যাড্রিনালিন রাশ (Adrenaline Rush-অ্যাড্রিনাল গ্ৰহি থেকে অ্যাড্রিনালিন নিঃসৱনেৰ কাৰণে তীব্ৰ উত্তেজনা ও উদ্বীপনাৰ শাৰীৱিক অনুভূতি) অনুভব কৰিছিলাম তা মিলিয়ন ডলাৰেও হয় না। সেই সময় বাব বাব বলা হচ্ছিল- স্থিৱ থাকাৰ জন্য কিন্তু সেই সময় প্ৰচণ্ড বাতাসেৰ তোড় শুৰু হওয়ায় বেশ বেগ পেতে হচ্ছিল স্থিৱ থাকতে। তাৰপৰও নিজেৰ ভেতৱেৰ অসীম ইচ্ছেটা সব সৃষ্টিৰ কৰে দিছিল। মনে হচ্ছিল কোনো সারভাইভাল হিলিউট মুভিৰ দুশ্যেৰ মধ্যে আছি, সেই ঘোৱ যেনে কাটছিল না, নিচে নামাৰ পৰ রেখা আপৰ তৈৱি কৰি পান কৰতে কৰতে মনে হচ্ছিল- জীবন সুন্দৰ, এটা অনুভব কৰাৰ জন্য হলেও একবাৰ এমন রোমাঞ্চকৰ অভিজ্ঞতা দৰিকৰাৰ। এৱপৰ গিয়েছিলাম এক্সট্ৰিম হ্যামকিংয়েৰ ইভেন্টে। নাপিভাচ্ছা ট্ৰেইলে মাটি থেকে ১১০ ফুট উচ্চতায় দুই পাহাড়েৰ মাবাখানে হ্যামক ঝুলিয়ে দোল খাওয়াৰ অভিজ্ঞতা নিজে না কৰলে কখনো বলে



বোৰানো সৃষ্টিৰ না। প্ৰথমে খাড়া পাহাড় বেয়ে উঠতে হয় ট্ৰ্যাকিং কৰে। এৰ মধ্যে শুৰু হলো বৃষ্টি। সেপ্টেম্বৰ মাস ছিল। পাহাড়ে বুম বৃষ্টিৰ সাথে ফ্লাশ ফ্লাডেৰ কথা নিশ্চয়ই অভিযানীৰ জানেন। পিছিল পাহাড়ি পথ বেয়ে অ্যাক্সেন্টৰ পয়েন্টে গিয়ে টাইরোলিন ট্ৰাভাস কৰে ১০ মিটাৰ ডিস্টেন্স শুন্যে বুলে পাৰ হয়ে হ্যামকে

পৌছাতে লাইফ টাইম এক্সপেৰিয়েন্স। জীবনেৰ একটা সময় বাৰ্ধক্য ছুয়ে যাবে, তখন মন চাইলেও দেহেৰ সেই শক্তি থাকবে না, কিন্তু মষ্টিকেৰ নিউরনে যে সুন্দৰ রোমাঞ্চ অনুৱন্দন দিয়ে যাবে, তা ঠিক মৃত্যুৰ আগ মুহূৰ্তে যে যাপিত জীবনেৰ সুন্দৰ সুতিৰ যে ফ্লাশব্যাক দেখবো তাৰ মধ্যে থাকবে নিশ্চিতভাৱে।

ৰ্যাপলিং নিয়ে কিছু পৰামৰ্শ

হারনেসেৰ সঙ্গে ক্যারসভেনোৱেৰ সাথে ফিগার অব এইট সংযুক্ত কৰে এই অ্যাক্সেন্টিতে অংশ নেয়া হয়। অনেকেই হয় তো জানেন না আগমী অলিম্পিকে ক্লাইঞ্জিং একটি ইভেন্ট হিসেবে যুক্ত হচ্ছে। তাই তুমুল সভাবনা আছে বাংলাদেশেৰ তৰঁঘণেৰ এখানে অংশগ্ৰহণ এবং দারণ কিছু কৰাৰ। ৰ্যাপলিংয়েৰ কিছু বেসিক একটু বলি।

ব্ৰিফিং-ট্ৰেনিং-প্ৰ্যাকটিস

সেফটি ব্ৰিফিং দেয়া হয়। তিনটি সাধাৰণ বিষয় থাকে মূলত। এগলো মেনে চলতে হয় সাবাদিন। এৱপৰ ট্ৰেনিং শুৰু হয়। তাৰপৰ হয় অনুশীলন। যতক্ষণ ন আপনার ব্যালেন্স, অ্যাক্সেন্টটি, কলফিডেন্স লেভেল ভালো না হচ্ছে ততক্ষণ অনুশীলন কৰানো হয়।

গিয়াৰ ও ৰোপ

গিয়াৰগুলোৰ ওয়েট ক্যারি কৰাৰ ক্ষমতা কমপক্ষে ২৫ কেণ্টেন। অৰ্থাৎ ২৫০০ কেজিৰ ওপৰ। একজন মানুষেৰ ভাৰ কত? ৫০/১০০/ ১৫০ কেজি। ৰোপ তাৰ চেয়ে বৰ্ণণ ধাৰণ ক্ষমতাৰ থাকে।

দুই ৰোপেৰ নিৰাপত্তা

এটিই সবচেয়ে গুৰুত্বপূৰ্ণ। প্ৰতিটি গিয়াৰেৰ ওয়েট ক্যারি কৰাৰ ক্ষমতা প্ৰয়োজনেৰ চেয়ে অনেক অনেক বেশি হলেও এক্সট্ৰা একটি ৰোপ ব্যবহাৰ কৰা হয় ব্যাকআপ হিসেবে। অৰ্থাৎ আপনি একটি ৰোপে রোপে ৰ্যাপলিং কৰবেন, আৰ আপনার শৱাবীৰে বাঁধা অন্য একটি ৰোপ উপৰে কুন্দেৰ হাতে থাকবে। ওই ৰোপেৰ কন্ট্ৰোল সম্পূৰ্ণ তাৰেৰ হাতে থাকে। ফলে আপনি

কোনো ভুল কৰলে বা কোনো কাৰণে আপনাকে উপৰে তুলে ফেলতে হলে বা আপনি যে ৰোপ ও গিয়াৰেৰ সাহায্যে নামছেন সেটিতে বাই অ্যানি চাল কোনো ক্ৰিট চলে আসলে সাথে সাথে এক্সট্ৰা ৰোপটিতে চলে আসা যায়। বিলে ৰোপ এবং বিলে দেয়া এই ইভেন্টেৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়।

ৰেসকিউ

উপৰে একজন ইস্ট্রাক্টৰ সৰ্বদা গিয়াৰ আপ হয়ে প্ৰস্তুত থাকে, যাতে যেকোনো সমস্যায় এক সেকেন্ড সময়ও নষ্ট না কৰে অংশগ্ৰহণকাৰীৰ কাছে সাহায্য নিয়ে যাওয়া যায়। প্ৰস্তুত থাকে অংশগ্ৰহণকাৰীকৰীকে উপৰে তুলে আনাৰ সেট আপও।

ইস্ট্রাক্টৰ টিম

এই টিমে থাকে চারজন। একজন নিচে সবাইকে প্ৰ্যাকটিস কৰিয়ে প্ৰস্তুত কৰায় মূল ক্লাইঞ্জেৰ জন্য। বিতীয় ও তৃতীয় জন থাকে মূল অ্যাক্সেন্ট পয়েন্টে। মেইন ৰোপে অংশগ্ৰহণকাৰীকে নামাতে থাকে। বিলে ৰোপে অতিৰিক্ত নিৱাপত্তা নিশ্চিত কৰতে সাথে থাকে সাপোর্ট টিম মেঘাৰ এবং ডিভাইস। চতুৰ্থ জন নিচে থাকে। মেইন ৰোপে অ্যারেন্ট কন্ট্ৰোল কৰে এবং প্ৰস্তুত থাকে যাতে কোনো পৰিস্থিতি কোনোভাবে সৃষ্টি হলে দ্রুততম সময়েৰ মধ্যে ৰোপ বেয়ে উপৰে উঠে সাহায্য পৌছে দেয়া যায়। সাথে থাকে সাপোর্টিং টিমেৰ এক বা দুইজন সদস্য। ইস্ট্রাক্টৰ ও সাপোর্টিং টিমেৰ মেঘাৰ মিলিয়ে কমপক্ষে ছয়জন থাকে। লেখক: প্ৰোডিউসাৰ, ক্লিপ্ট রাইটাৰ, আৱজে (এবিসি রেডিও) ◆



নারীদের নিরাপদ ভ্রমণে লেডিবার্ড

■ সেহেলী আজিজ মো

বেশিরভাগ সময়ই নারীরা নিজের ভেতরকার ‘আমিংটাকে ভীষণ অবহেলা করে। অধিকাংশ সময়ই তারা মনে করতে পারেন না- শেষ করে প্রাণ খুলে হেসেছিলেন! হাসতে হাসতে চোখে পানি চলে এসেছিল! সকাল থেকে রাত অবধি নারীরা শুধুই অন্যের জন্য বাঁচতে শেখে। যা শেখে না তা হলো- নিজের জন্য বাঁচা। পড়াশোনার ব্যস্ততা, গতানুগতিক জীবন, স্বামী, সংসার, বাচ্চা, শঙ্গু-শাঙ্গুড়ি, নন্দ-দেবর, অফিসের কলিগ, সোকলড সামাজিক বন্ধুবান্ধব- এসব দায়িত্বের ভিড়ে নিজেকে নিয়ে ভাবার আর অবকাশই হয়ে ওঠে না নারীর। তাই নারীদের বলছি- এবার নিজের জন্য সময় বের করুন। ২৪ ঘণ্টায় ২৪ মিনিটের জন্য হলেও। আয়নার সামনে দাঁড়ান। ভালো করে তাকান। দেখুন তো, শরীরের কোথায় কোথায় যত্তের বজ্জ অভাব পড়েছে! আপনার ফুলের গাছে বা প্রিয় ট্রেটায় দিন শেষে যেমন আপনি পানি ঢালতে ভোলেন না, তেমনি নিজের দেহ নামক গাছটায় পানি ঢালতে ভুলে যাবেন না। বাচ্চাদের জন্য হুলিঙ্গ আর স্বামীর জন্য চা বানানোর পাশাপাশি নিজের জন্যও এক মগ গ্রিন টি বানিয়ে থান। ফিট থাকার চর্চাটা শুরু করুন আজকে থেকেই। খোলা বাতাসে প্রাণ ভরে শ্বাস নিন। আপনার যা যা করতে ভালো লাগে, তা করুন। একটা সময়ের পর এসে আর কোনে কিছুই ম্যাটার করে না। ম্যাটার করে শুধু নিজের ভালো থাকা, সুস্থ থাকা। আর সুস্থ থাকার জন্য প্রকৃতির কাছাকাছি যাওয়াটা খুবই

Ladybird
Holidays

sky is yours
www.ladybirdholidays.com

যোগাযোগ

- ৯৭/১ শুক্রবাদ, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৭
- +৮৮ ০১৮৮৬৯৯৮৯৮
- info@ladybirdholidays.com
- www.ladybirdholidays.com
- ladybirdholidays
- ladybirdholidays

প্রয়োজন। প্রয়োজন খোলা আকাশের নিচে বুক ভরে শ্বাস নেয়া। আর সেই সুযোগটা করে দিচ্ছে এবার লেডিবার্ড হলিডেস।

দৈনন্দিন জীবনের সব কর্মব্যস্ততাকে একপাশে সরিয়ে চলন এবার লেডিবার্ড হলিডেসের সাথে বেরিয়ে পড়ি বিশ্বকে দেখতে। সম্পূর্ণ নারী দ্বারা পরিচালিত এই গ্রুপে আপনি পাবেন আপনার সময় এবং সুবিধা মতো গ্রুপ ট্যুরের ব্যবস্থা। দেশের এবং দেশের বাইরের বিভিন্ন আকর্ষণীয় জায়গায় ঘোরার জন্য এখন আর নারীদের দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই। নেই নিরাপত্তাজনিত কোনো প্রশ্ন। নারীদের সর্বোচ্চ নিরাপত্তা আর কমফোর্ট জোনের কথা

ভেবেই লেডিবার্ডে থাকছে দেশ এবং দেশের বাইরে আকর্ষণীয় সব প্যাকেজ। চাইলেই এই গ্রুপ ট্যুর আপনারা কাস্টমাইজ করে নিতে পারেন। হতে পারে ঝুল জীবনের পুরোনো সব বাস্তবী অথবা কর্মক্ষেত্রের প্রিয় নারী সহকর্মীদের সাথে। নিজেকে দিন এবার কিছুটা কোয়ালিটি টাইম। আপনার জন্য রয়েছে এখানে দেশ এবং দেশের বাইরের নানা সাক্ষীয় ও আকর্ষণীয় প্যাকেজ।

আসন, জীবনে যুক্ত করি কিছু নতুন বস্তু। লেডিবার্ডের ডানায় ভর করে এবার আপনি উপভোগ করুন পুরো বিশ্বকে। ক্লান্তি শেষে আপনার দেহ ও মনে ফিরে আসুক প্রশান্তি; যা আপনাকে করে তুলবে ফিট। মনে রাখবেন- আপনি ফিট তো... দুনিয়া হিট! লেখক: এঙ্গিকিউটিভ ডি঱ের্টের, লেডিবার্ড হলিডেস ◆



বিদেশে বাংলাদেশ দূতাবাসের ঠিকানা

বাংলাদেশ দূতাবাস, নেপাল

বসুন্ধরা, ওয়ার্ড নং-৩, চক্রপথ
কাঠমান্ডু, নেপাল

টেলিফোন: +৯৭১৪৯৭০১৩০/৮৯৭০-১৩১ (পিএবিএক্স)
ফ্যাক্স: +৯৭১৪৯৭০১৩২
ইমেইল: mission.kathmandu@mofa.gov.bd

বাংলাদেশ ডেপুটি হাইকমিশন, কলকাতা

৯, সার্কাস এভিনিউ, লোয়ার রেঞ্জ
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সরণি
কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০১৭, ভারত
ফোন: +৯১৩৩৪০১২৭৫০০

বাংলাদেশ হাইকমিশন, ভারত

ইপি-৩৯, ড. সর্বগল্পী রাধাকৃষ্ণন সড়ক
চাপকচুরী, নতুন দিল্লি-১১০০২১
ভারত

পিএবিএক্স: +৯১১১২৪১২১৩৯১-৯৮
ফ্যাক্স: (৯১-১১) ২৬৮৭৮৯৫৩
ইমেইল: mission.newdelhi@mofa.gov.bd

বাংলাদেশ দূতাবাস, ভুটান

প্লট: এইচআইজি-৩
আপার চুবাচু, থিস্মু, ভুটান
ফোন: +৯৭৫২৩৩২৭৭১

জরুরি যোগাযোগ: +৯৭৫৭৭২৮৬১৫২
ইমেইল: mission.thimphu@mofa.gov.bd

বাংলাদেশ দূতাবাস, শ্রীলংকা

৩, শ্রীমাথ আরজি সেনানায়েক মাওয়াথা
কলঞ্চো-৭, শ্রীলংকা

ফোন: +৯৪১১২৬৯৫৭৪৪২৬৯৫৭৪৮
ফ্যাক্স: +৯৪১১২৬৯৫৫৫৬

ইমেইল: bdhclanka@mofa.gov.bd

বাংলাদেশ দূতাবাস, মালদ্বীপ

প্লট: ১০৯৮২, নিরোলহ মাগ, গোয়ালহি-১৬
হলহমালে, মালদ্বীপ

টেলিফোন: (৯৬০) ৩৩২০৮৫৯ ফ্যাক্স: (৯৬০) ৩৩১৫৫৪৩

ইমেইল: mission.male@mofa.gov.bd

বাংলাদেশ দূতাবাস, থাইল্যান্ড

৪৭/৮ একামাই সুই ৩০, শুকহামভেট ৬৩
ব্যাংকক-১০১১০, থাইল্যান্ড

ফোন: +৬৬ (০) ২৩৯০৫১০৭-৮
ফ্যাক্স: +৬৬ (০) ২৩৯০৫১০৬

হটেলাইন নাম্বার: +৬৬৯৫২৭২০৩১৪ ও +৬৬৯৪৬৬৩২০২৭
ইমেইল: mission.bangkok@mofa.gov.bd

বাংলাদেশ দূতাবাস, ইন্দোনেশিয়া

জেএল জায়া মন্ডলা রায়া, ৯৩ মেনটেপ ডালাম, তেরেত, জাকার্তা,
সেলেতান-১২৭৮০, ফোন: +৬২২১২২৮৩৫৪৭৬,

+৬২২১২২৮৩৫৪৭৭, ফ্যাক্স: ৬২২১২৮৫৪৩৭৬৫, হটেলাইন
নম্বর: +৬২৮৭৭৭০০৬৬৮৮৯, +৬২৮১৩৮৮৭০০৫২২

ইমেইল: mission.jakarta@mofa.gov.bd,
bdootjak@yahoo.com

বিআরইএলের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর বাংলাদেশে যাত্রা শুরু হোটেল তাজ ও ভিভান্তার

পর্যটন সংবাদ

■ পর্যটন বিচিত্রা প্রতিবেদন

বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো যাত্রা শুরু করতে যাচ্ছে আইকনিক হোটেল ‘তাজ’ ও ‘ভিভান্তা’। এ উপলক্ষে গতকাল ১৭ এপ্রিল রাজধানীর শেরাটনে চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানের আয়োজন করে বোরাক রিয়েল এস্টেট লিমিটেড (বিআরইএল)। অনুষ্ঠানে বিআরইএল ও ইউনিক গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) মোহা. নূর আলী বলেন, বাংলাদেশে হোটেল ও আতিথেয়তা ব্যবস্থাপনায় একটি নতুন অধ্যয় যুক্ত করবে তাজ এবং ভিভান্তা। এ যাত্রা আমাদের অর্থনীতি ও জিডিপিতেও উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে।

জমকালো এ অনুষ্ঠানে বিআরইএলের পক্ষে এমডি মোহা. নূর আলী এবং দ্য ইভিয়ান হোটেলস কোম্পানি লিমিটেডের (আইএইচসিএল) পক্ষে রিয়েল এস্টেট অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট সুমা ভেঙ্কটেশ এবং এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট ও জেনারেল কাউন্সেল রাজেন্দ্র মিশ্র চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। এ সময় আইএইচসিএলের অ্যাসোসিয়েট ভাইস প্রেসিডেন্ট রিয়েল এস্টেট অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট রোহন বানাডে এবং বিআরইএলের চেয়ারপ্রারসন সেলিনা আলী উপস্থিত ছিলেন। চুক্তির অধীনে ভারতের শীর্ষস্থানীয় এ প্রতিষ্ঠানটি বিআরইএলের সঙ্গে যৌথভাবে এ দুটি হোটেল পরিচালনা করবে রাজধানীর গুলশানে।

চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে মোহা. নূর আলী আরও বলেন, এ দুটি হোটেল থেকে সরকার বছরে এক থেকে দেড়শ কোটি টাকা রাজস্ব পাবে এবং এখানে প্রায় দুই হাজার লোকের কর্মসংস্থান হবে। তিনি বলেন, দ্য ওয়েস্টিন ঢাকা ও শেরাটন ঢাকা বাংলাদেশে হসপিটালিটি ব্যবসার কালচার বদলে দিয়েছে। আমি নিশ্চিত যে, আমরা তাজ ও ভিভান্তার কাছ থেকে



**বিআরইএল ও ইউনিক গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) মোহা. নূর আলী বলেন,
বাংলাদেশে হোটেল ও
আতিথেয়তা ব্যবস্থাপনায় একটি নতুন অধ্যয় যুক্ত করবে তাজ এবং ভিভান্তা। এ যাত্রা আমাদের অর্থনীতি ও জিডিপিতেও উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে। এ**

বিআরইএল ও ইউনিক গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) মোহা. নূর আলী বলেন, বাংলাদেশে হোটেল ও আতিথেয়তা ব্যবস্থাপনায় একটি নতুন অধ্যয় যুক্ত করবে তাজ এবং ভিভান্তা। এ যাত্রা আমাদের অর্থনীতি ও জিডিপিতেও উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে। এ

আরও অনেক কিছু শিখতে পারব।

এ সময় মোহা. নূর আলী আরও বলেন, তাজের আতিথেয়তা, সেবা, সংস্কৃতি, পরিবেশ ও অন্য অনেক কিছুই আমি ব্যক্তিগতভাবে পছন্দ করি। তিনি বলেন, আমাদের দেশের মানুষ, বিশেষ করে নারীরা শাড়ির মতো পণ্য কিনতে ভারতে যান।

আমি নিশ্চিত, তাজ ও ভিভান্তার ভবনটি শুধু ৩৬০ কক্ষের একটি বিল্ডিং নয়, এখানকার জুয়েলারিসহ অন্যান্য দোকানও ভালো চলবে। আমাদের দেশের মানুষ এখানে এসে ভারতের স্বাদ পাবেন।

তিনি জানান, তাজ এক লাখ দশ হাজার মানুষকে সেবা দেবে। দোকান ও রেস্তোরাঁয় আতিথেয়তা পাবে দেড় লাখ থেকে দুই লাখ অতিথি।

ইউনিক হোটেল অ্যান্ড রিসোর্টস পিএলসির মালিকানাধীন কোম্পানি ইউনিক গ্রুপ ও বিআরইএল। বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় হোটেল অ্যান্ড হসপিটালিটি ম্যাজেন্জিমেন্ট প্রতিষ্ঠান পাঁচতারকা হোটেল ম্যারিয়েট ইন্টারন্যাশনাল, দ্য ওয়েস্টিন ঢাকা, শেরাটন ঢাকা এবং চারতারকা বুটিক হোটেল হানসা সফলভাবে পরিচালনা করছে এ কোম্পানিটি।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী মো. মাহবুব আলী। তিনি বলেন, বাংলাদেশ ও ভারতের অভিন্ন ঐতিহ্য ও ইতিহাস রয়েছে। প্রকৃতি, ইতিহাস ও সংস্কৃতিতে আবদ্ধ আমাদের বন্ধুত্বপূর্ণ দুই দেশের মধ্যে পর্যটন ও আতিথেয়তা শিল্পে সহযোগিতা বিকাশে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে।

তিনি আরও বলেন, দুই দেশের স্বনামধন্য দুটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে স্বাক্ষরিত আজকের (গতকাল) চুক্তিটি পর্যটন ও আতিথেয়তা শিল্পে আমাদের পারস্পরিক অভিজ্ঞতা বিনিয়য় করতে দেবে। এটি আমাদের উপমহাদেশীয় আতিথেয়তা ও সংস্কৃতি যৌথভাবে বিশেষ কাছে তুলে ধরার সুযোগ দেবে। ইউনিক হোটেল অ্যান্ড রিসোর্টস পিএলসির সিইও শাখাওয়াত হোসেন বলেন, এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তাজ ও ভিভান্তা বাংলাদেশের অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন সিএএবির চেয়ারম্যান এয়ার ভাইস মার্শাল মফিদুর রহমান, নিটল নিলয় গ্রুপের চেয়ারম্যান আবদুল মাতলুব আহমদ প্রমুখ। ◆





DHAKA DINNER CRUISE
ঢাকা ডিনার ক্রুজ



Experience Riverine Bangladesh

Dinner Cruise

4 Hours Cruising by

MV Bonobibi Vessel with
Snacks and Dinner

2000 BDT/Per Person

*minimum 10 persons

Day Cruise

6 Hours Cruising by

MV Bonobibi Vessel with
Snacks and Dinner

2500 BDT/Per Person

*minimum 10 persons

Moonlight Overnight Cruise

1 Day-1 Night Cruising by

MV Bonobibi Vessel with
Cabin and Meals

6000 BDT/Per Person

*Double sharing; minimum 10 persons

Contact for Reservation:

+880 1979 224 593
+880 1708 427 790
+880 1730 450 099

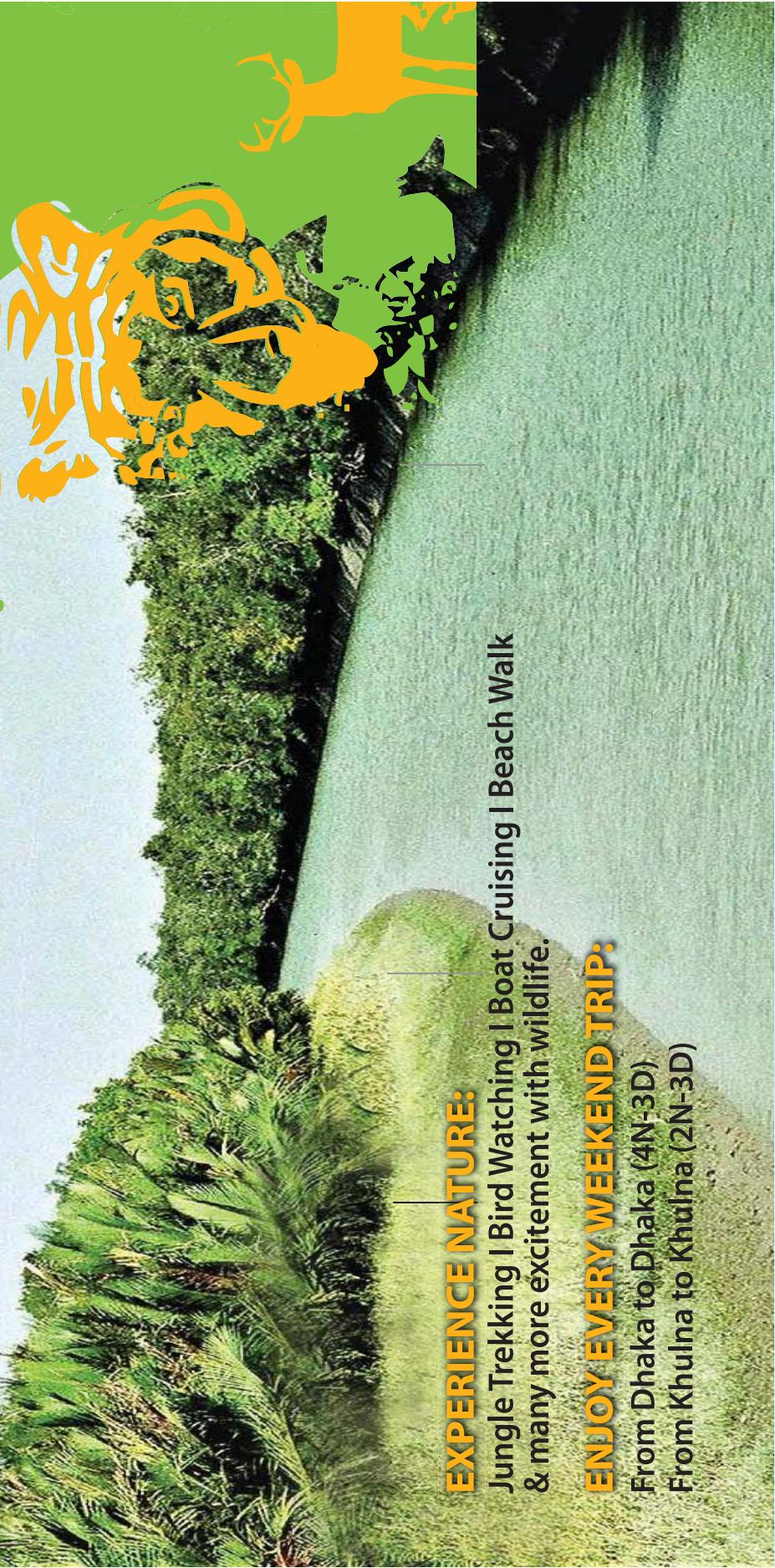
নদী অমরণে প্রেত বিনোদন
www.dhakadinnercruise.com



World
Heritage
Site

United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization

Choto SUNDARBANS



EXPERIENCE NATURE:

Jungle Trekking | Bird Watching | Boat Cruising | Beach Walk
& many more excitement with wildlife.

ENJOY EVERY WEEKEND TRIP:

From Dhaka to Dhaka (4N-3D)
From Khulna to Khulna (2N-3D)

Please contact
for more details



RIVER AND GREEN TOURS

House-97/1, Flat-2B, Sukrabad, Sher-e-Bangla Nagar
Dhaka-1207, Bangladesh
E-mail: rgtour@gmail.com, info@riverandgreen.com
www.riverandgreen.com

+88 01819224593
+88 01730450099

পর্যটন বিচিত্রণ



‘মুজিবের বাংলাদেশ’ গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন

পর্যটন সংবাদ

■ পর্যটন বিচিত্রা প্রতিবেদন

৫৩তম মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে বেসামরিক বিমান ও পর্যটন মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত ‘মুজিবের বাংলাদেশ’ শীর্ষক আরক গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। গেল ২৬ মার্চ সকালে গণভবন থেকে প্রধানমন্ত্রী আরক গ্রন্থটির মোড়ক উন্মোচন করেন।

বইটির মুখ্যবন্ধু বলা হয়েছে, বাঙালি জাতির ইতিহাসে অবিনশ্বর শ্রেষ্ঠ নাম সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ এক ও অবিচ্ছেদ্য। আক্ষরিক অর্থেই বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ সমার্থক। হাজার বছর ধরে বাঙালি জাতির নিজস্ব রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার যে স্বপ্ন, তারই সফল কৃপকার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব। তিনি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রোহ ও প্রতিষ্ঠাতা।

হাজার বছর ধরে এ অঞ্চলের মানুষ বিদেশি

শাসকদের দ্বারা শোষিত হয়েছে। বিদেশি শাসকদের বিরুদ্ধে বহুবার বাঙালি বিদ্রোহ করেছে, সংগ্রাম

করেছে, রক্ত দিয়েছে কিন্তু স্বাধীনতার স্বাদ পায়নি।

সেই অতৃপ্তি আকাঙ্ক্ষা পূরণে বাংলার মাটি, বাংলার

পানি, বাংলার প্রাণ ও প্রকৃতির হাজার বছরের একাগ্র

প্রার্থনায় এ ভূখণ্ডে জন্ম নেন বাংলার মুক্তিদ্বৃত্ত শেখ

মুজিবুর রহমান। বলা হয়ে থাকে, প্রথিতীর আড়াই

হাজার বছরের ইতিহাসে বঙ্গবন্ধুর মতো নেতার জন্ম

একটি বিরল ঘটনা। যার জন্ম না হলে বিশ্বের

মানচিত্রে বাংলাদেশ নামের কোনো ভূখণ্ডের চিত্র

অঙ্গীকৃত হত না। তিনি বাঙালির হাজার বছরের

স্বপ্নকে সফল করেছেন।

মহান পুরুষ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর

রহমান শুধু স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রোহ ছিলেন না, তিনি ছিলেন বাংলাদেশের প্রকৃত স্বপ্নত।

মাত্র সাড়ে তিনি বছরের মধ্যে তিনি ধূঃসন্প্রাণ একটি

দেশের অবকাঠামো পুনর্নির্মাণ করেছেন। তিনি

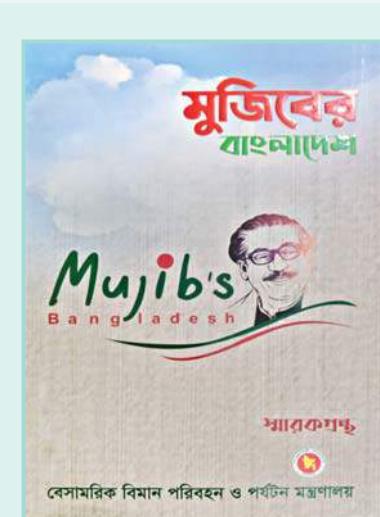
জাতিকে একটি আধুনিক গণতান্ত্রিক সংবিধান

উপহার দিয়েছেন। তিনি রাষ্ট্রের পরিচয় বহনকারী

জাতীয় সঙ্গীত, জাতীয় পতাকা এবং জাতীয় প্রতীক

আমাদের দিয়ে গেছেন। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা

প্রণয়ন, কেন্দ্রীয় ব্যাংক, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্চের



হাজার বছর ধরে এ অঞ্চলের মানুষ বিদেশি শাসকদের দ্বারা শোষিত হয়েছে। বিদেশি শাসকদের বিরুদ্ধে বহুবার বাঙালি বিদ্রোহ করেছে, সংগ্রাম করেছে, রক্ত দিয়েছে কিন্তু স্বাধীনতার স্বাদ পায়নি। সেই অতৃপ্তি আকাঙ্ক্ষা পূরণে বাংলার মাটি, বাংলার পানি, বাংলার প্রাণ ও প্রকৃতির হাজার বছরের একাগ্র প্রার্থনায় এ ভূখণ্ডে জন্ম নেন বাংলার মুক্তিদ্বৃত্ত শেখ মুজিবুর রহমান।

কমিশনসহ নানাবিধ প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন দক্ষতার সাথে। জাতিসংঘ এবং এর সকল সংস্থার সদস্য পদ অর্জন, অধিকার্শ রাষ্ট্রের স্থানীয় অর্জন,

পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের সাথে কটনেতিক সম্পর্ক স্থাপন এবং প্রশিদ্ধানযোগ্য একটি বৈদেশিক নীতি ‘সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারো সাথে বৈরিতা নয়’ প্রণয়ন করেছেন। ভেঙে পড়া অর্থনৈতিক চাকাকে চালু করা, খাদ্য সাহায্য ও উৎপদন নিশ্চিত করতে যথাযথ পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। খাদ্য, বন্দু, বাস্থান, স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার পাশাপাশি দুর্যোগ মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে এবং অর্থনৈতিকভাবে একটি সমৃদ্ধ জাতি গঠনে তিনি একের পর এক নানা পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন এবং তার বাস্তবায়ন করেছেন। আজ যদি বঙ্গবন্ধু বেঁচে থাকতেন তবে যুক্তের ধূঃসন্প্রাণ থেকে উঠে আসা সেদিনের বাংলাদেশ অনেক আগেই উন্নত রাষ্ট্র পরিণত হতো।

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়

জানিয়েছে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সূর্যজয়ন্তি উদযাপন

উপলক্ষে তার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা নিবেদনের অংশ হিসেবে তারা পর্যটন কান্তি

ব্র্যান্ডনেম হিসেবে ‘Mujib’s Bangladesh’ নির্ধারণ করেছে এবং পর্যটন বিষয়ক সকল ধরনের

প্রচার-প্রচারণায় কান্তি ব্র্যান্ডনেম ‘Mujib’s Bangladesh’ ব্যবহার করেছে। বিশ্বাসীর কাছে

বাংলাদেশের পরিচিতকে তুলে ধরা ও পর্যটন শিল্পের প্রচার ও বিপণনে বঙ্গবন্ধুর ক্যারিশম্যাটিক

ব্যক্তিত্ব ও ইমেজ এক গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তিলিঙ্গ হিসেবে কাজ করবে বলে তাদের বিশ্বাস। ইতোমধ্যে

‘Mujib’s Bangladesh’ এর লোগো, আরক, ডাকটিকিট অবমুক্ত এবং খাম উন্মুক্ত করা হয়েছে। এর মাধ্যমে পর্যটন প্রচারণা কার্যক্রমে নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে। ‘Mujib’s Bangladesh’

লোগোতে ব্যবহৃত বঙ্গবন্ধুর ছবি, লোগোতে ব্যবহৃত রং বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ,

যা বাংলাদেশের গৌরবান্বিত মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে পর্যটকদের অনুভব করতে সহায়তা করবে। এর

মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর প্রতি বিনোদ শ্রদ্ধা নিবেদন এবং

নতুন পদ্ধতিতে ট্রেনের টিকিট যেভাবে কাটা যাবে

■ পর্যটন বিচিত্রা ডেক্স

জাতীয় পরিচয়পত্র বা জন্মনিবন্ধন সনদ ছাড়া এখন থেকে ট্রেনের টিকিট কাটা যাবে না। বিদেশি নাগরিকদের ট্রেনে ভ্রমণে পাসপোর্ট দেখিয়ে টিকিট নিতে হবে।

রেলের টিকিট কাটতে হলে জাতীয় পরিচয়পত্র কিংবা জন্মনিবন্ধন দিয়ে নিবন্ধন করতে হবে। এরপর তা নির্বাচন করিশনে রক্ষিত ডেটাবেজ থেকে যাচাই করা হবে। এরপরই টিকিট কাটতে পারবেন যাত্রীর। একজনের জাতীয় পরিচয়পত্র দিয়ে টিকিট কেটে অন্য কেউ ট্রেনে ভ্রমণ করতে পারবে না।

অনলাইনের মাধ্যমে কীভাবে নিবন্ধন করা যাবে।
পুরোনো নিবন্ধনকারীর ক্ষেত্রে:

ধাপ-১

বর্তমান Username ও Password দিয়ে
<https://eticket.railway.gov.bd> ওয়েবসাইট
বা rail sheba app-এ সাইন ইন (Sign In)
করতে হবে।

ধাপ-২

NID নম্বর ও জন্ম তারিখ লিখে verify বাটনে



ক্লিক করতে হবে।

NID নম্বর ও জন্ম তারিখ সঠিকভাবে প্রবেশ করালে যদি এনআইডি নম্বরটি আগে ব্যবহার করা না হয়ে থাকে, তাহলে রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া সফলভাবে সম্পন্ন হবে।

নতুন নিবন্ধনকারীর ক্ষেত্রে

<https://eticket.railway.gov.bd> ওয়েবসাইট
অথবা rail sheba app-এ গিয়ে সাইন আপ
(Sign Up) করতে হবে এবং সঠিক NID নম্বর ও জন্ম তারিখ verify পূর্বক অন্যান্য তথ্য প্রদান

সাপেক্ষে রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া সফলভাবে সম্পন্ন করতে হবে।

অফলাইন/এসএমএসের মাধ্যমে নিবন্ধনপদ্ধতি মোবাইল থেকে মেসেজ অপশনে গিয়ে টাইপ করতে BR<space>NID নম্বর <space> জন্ম তারিখ (জন্ম তারিখের ফরম্যাট-জন্মের সাল/মাস/দিন) এসএমএস পাঠাতে হবে ২৬৯৬৯ নাম্বারে।

ফিরতি এসএমএসের মাধ্যমে নিবন্ধন সফল বা ব্যর্থ হয়েছে কিনা, তা জানিয়ে দেওয়া হবে।
নিবন্ধনের ক্ষেত্রে কিছু শর্ত রয়েছে।

নিবন্ধনের শর্তসমূহ

- ১২ থেকে ১৮ বছর বয়সী যাত্রীরা পিতা বা মাতার নাম ও এনআইডি দ্বারা নিবন্ধনকৃত রেলওয়ে অ্যাকাউন্ট অথবা জন্মনিবন্ধন নম্বর প্রদান ও জন্মনিবন্ধন সনদের মাধ্যমে নিবন্ধনকৃত অ্যাকাউন্ট দ্বারা পৃথক/এককভাবে টিকিট কিনতে পারবে। এরপর ক্ষেত্রে টিকিটের ওপরে মুদ্রিত নামের সঙ্গে যাত্রীর সম্পর্ক যাচাইয়ের জন্য ভ্রমণকালে বাধ্যতামূলকভাবে জন্মনিবন্ধন সনদের ফটোকপি সঙ্গে রাখতে হবে।
- বিদেশি নাগরিকের পাসপোর্ট নম্বর প্রদান ও পাসপোর্টের ছবি আপলোড করার মাধ্যমে নিবন্ধন সম্পন্ন করবেন।
- সফলভাবে এনআইডি/পাসপোর্ট/জন্মনিবন্ধন যাচাইপূর্বক নিবন্ধন ব্যক্তিত কোনো যাত্রী আন্তঃনগর ট্রেনের টিকিট কিনতে পারবেন না।
- ভ্রমণকালে যাত্রীকে অবশ্যই নিজস্ব এনআইডি বা জন্মনিবন্ধন সনদের ফটোকপি অথবা পাসপোর্ট/ছবিসংবলিত আইডি কার্ড সঙ্গে রাখতে হবে।
- পরিচয়পত্রের সঙ্গে টিকিটের ওপরে মুদ্রিত যাত্রীর তথ্য না মিলে যাত্রীকে বিনা টিকিট ভ্রমণের দায়ে অভিযুক্ত করা হবে এবং বাংলাদেশ রেলওয়ের প্রচলিত আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
- যাত্রীরা ১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ থেকে জাতীয় পরিচয়পত্র, জন্মনিবন্ধন সনদ বা পাসপোর্টের মাধ্যমে বাংলাদেশ রেলওয়ের সিটেমে নিবন্ধনপ্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে পারছেন।



Bangladesh
Railway

From

To

Date of Journey

Choose a Class

- দেশের বিভাগীয় শহরের রেলস্টেশন ও আন্তঃনগর ট্রেনের প্রারম্ভিক স্টেশনগুলোয় সর্বসাধারণের নিবন্ধনপ্রক্রিয়ায় সহযোগিতা করার জন্য একটি করে হেল্প ডেক্স স্থাপন করা হবে।

টিকিট যার ভ্রমণ তার

রেলওয়ের সিদ্ধান্ত অনুসারে, জাতীয় পরিচয়পত্র বা জন্মনিবন্ধন সনদ যাচাইয়ের মাধ্যমে আন্তঃনগর

ট্রেনের টিকিট কাটতে হবে। রেলের কর্মকর্তারা পয়েন্ট অব সেল (পিওএস) মেশিনের মাধ্যমে টিকিট যাচাই করবেন। কেউ অন্যের জাতীয় পরিচয়পত্র দিয়ে টিকিট কেটে ভ্রমণ করলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এ ব্যবস্থাকে 'টিকিট যার ভ্রমণ তার' বলছে রেলওয়ে। টিকিট কালোবাজারি বন্ধ ও স্মার্ট বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার সরকারি উদ্যোগের অংশ এটি। ◆



বাংলাদেশ-ভারত ট্রেনের সময়সূচি

মেট্রী এক্সপ্রেস (৩১০৭)

অমগ্নের দিন	ঢাকা থেকে ছাড়বে	কলকাতায় পৌঁছাবে
শুক্রবার	সকাল ৮.১৫	বিকাল ৩.৩০
রোববার	সকাল ৮.১৫	বিকাল ৩.৩০
মঙ্গলবার	সকাল ৮.১৫	বিকাল ৩.৩০

মেট্রী এক্সপ্রেস (৩১০৯)

অমগ্নের দিন	কলকাতা থেকে ছাড়বে	ঢাকায় পৌঁছাবে
শুক্রবার	সকাল ৭.১০	বিকাল ৪.৫
মঙ্গলবার	সকাল ৭.১০	বিকাল ৪.৫

মেট্রী এক্সপ্রেস (৩১০৮)

অমগ্নের দিন	কলকাতা থেকে ছাড়বে	ঢাকায় পৌঁছাবে
শনিবার	সকাল ৭.১০	বিকাল ৪.৫
সোমবার	সকাল ৭.১০	বিকাল ৪.৫
বৃথবার	সকাল ৭.১০	বিকাল ৩.৩০

মেট্রী এক্সপ্রেস (৩১১০)

অমগ্নের দিন	ঢাকা থেকে ছাড়বে	কলকাতায় পৌঁছাবে
শনিবার	সকাল ৮.১৫	বিকাল ৩.৩০
বুধবার	সকাল ৮.১৫	বিকাল ৩.৩০

বন্ধন এক্সপ্রেস (৩১২৯)

অমগ্নের দিন	কলকাতা থেকে ছাড়বে	খুলনায় পৌঁছাবে
রোববার	সকাল ৭.১০	দুপুর ১২.৩০
বৃহস্পতিবার	সকাল ৭.১০	দুপুর ১২.৩০

বন্ধন এক্সপ্রেস (৩১৩০)

অমগ্নের দিন	খুলনা থেকে ছাড়বে	কলকাতায় পৌঁছাবে
রোববার	দুপুর ১.৩০	বিকাল ৫.৪০
বৃহস্পতিবার	দুপুর ১.৩০	বিকাল ৫.৪০

মিতালী এক্সপ্রেস (৩১৩১)

অমগ্নের দিন	ঢাকা থেকে ছাড়বে	নিউ জলপাইগুড়ি পৌঁছাবে
সোমবার	রাত ৯.৫০	সকাল ৬.৪৫
বৃহস্পতিবার	দুপুর ১.৩০	বিকাল ৫.৪০

মিতালী এক্সপ্রেস (৩১৩২)

অমগ্নের দিন	নিউ জলপাইগুড়ি থেকে ছাড়বে	ঢাকায় পৌঁছাবে
রোববার	সকাল ১১.৪৫	রাত ১০.৩০
বৃথবার	সকাল ১১.৪৫	রাত ১০.৩০



ATF DHAKA 2023

THE BIGGEST EVER TOURISM EXPO IN BANGLADESH

10th ASIAN TOURISM FAIR

20 COUNTRIES 300 EXHIBITORS



September **21** **22** **23**, 2023

International Convention City Bashundhara (ICCB)
Dhaka, Bangladesh

Partners of ATF 2022

Endorsed by
 Ministry of Civil Aviation and Tourism

Supported by
 Bangladesh National Tourism Corporation

Organized by
 Parjatan Bichitra

Prime Partner Country
 nepal

Partner Country
 amazing THAILAND

Host Country
 Mujib's Bangladesh

IncredibleIndia

TOURISM MALAYSIA

Sri Lanka

Lithuania

Bosnia and Herzegovina

Feature Country

Airlines Partner
 Biman BANGLADESH AIRLINES

Hospitality Partner
 INTERCONTINENTAL DHAKA

Adventure Dining Partner
 FLY Dining

Cruise Partner
 DHAKA DINNER CRUISE

Entertainment Partner
 FANTASY KINGDOM

Transport Partner
 CONVOY SERVICE

ISP Partner
 BCL

Networking Event Partner
 BOTOF

www.asiantourismfair.com



TRAVEL WITH US UAE

BOOK YOUR TRAVEL NOW



Our Services

Visa | Air Ticket | Hotel | Meeting & Exhibition

Sightseeing | Transport

Corporate Event

Corporate Training | Documentary | Guide & logistics

Education / Medical / Migration Consultancy